POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ○

‘তুমি বল, ‘আল্লাহ্‌ ও এই রসুলের আনুগত্য কর; কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে (জানিও) আল্লাহ্‌ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

(আলে ইমরান, আয়াত: ৩৩)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 10

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 7 মার্চ, 2019 29 জামাদি আল সানি 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

একজন মুত্তাকিকে পরকালের জীবন ইহজগতেই দেখানো হয়। তারা ইহজগতেই খোদা লাভ করেন, তাঁকে দর্শন করেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।

একজন ওলীর উক্তি, ‘ যে ব্যক্তি আজীবন কোন সত্যস্বপ্ন লাভ করে নি, তার পরিণাম ভয়াবহ।’

এটিকে দৃষ্টিপটে রেখে মানুষের উচিত নামাযে ব্যকুল হয়ে দোয়া করা, এবং বাসনা করা উচিত সে সেই সমস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যারা উন্নতি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন। পাছে সে ইহজগত ত্যাগ করার মূহুর্তে অন্তর্দৃষ্টি ও দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে উত্থিত হয় আর পরকালেও দৃষ্টিহীন থাকে।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

মুত্তাকিকে ইহজগতেই পরকালের জীবন দেখানো হয়।

একটি নেয়ামত হল ওলীরা খোদার ফেরেশতাদেরকে দেখতে পান। পরকাল কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু একজন মুত্তাকিকে পরকালের জীবন ইহজগতেই দেখানো হয়। তারা ইহজগতেই খোদা লাভ করেন, তাঁকে দর্শন করেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। অতএব কেউ যদি এমনটি লাভ না করে, তবে তার মৃত্যু বরণ এবং ইহধাম হতে প্রস্থান করার মধ্যে আশাব্যঞ্জক কিছু নেই। একজন ওলীর উক্তি অনুসারে, যে ব্যক্তি আজীবন একটিও সত্য স্বপ্ন লাভ করে নি, তার পরিণতি ভয়াবহ, যেরূপে কুরআন মোমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছে যে, শোন! যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নেই, তার মধ্যে তাকওয়া নেই। অতএব আমাদের সকলের এই দোয়া করা উচিত যে, আমাদের মধ্যে এই শর্ত যেন পূর্ণ হয়। আল্লাহ্‌ তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম, সত্য-স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের আশিস লাভ হয়, কেননা, এটিই মোমিনের বৈশিষ্ট্য। এটি থাকা বাঞ্ছনীয়।

আরও অনেক বরকত ও কল্যাণ রয়েছে যা মুত্তাকিগণ লাভ করে থাকেন। যেমন সূরা ফাতেহা, যার দ্বারা কুরআন করীমের সূচনা হয়েছে, আল্লাহ্‌ সেখানে মোমিনদেরকে দোয়া প্রার্থনা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। **‘ইহদেনাস সিরাতাল মুস্তাকিমা সিরাতাল্লিযীনা আনআমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগযুবে আলাইহিম ওয়ালাযযাল্লীন।’** (সূরা ফাতিহা, আয়াত: ৬-৮) অর্থাৎ তুমি আমাদেকে সহজ সরল পথে পরিচালিত কর, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পথে যে পথে তুমি তাদেরকে পুরস্কৃত করেছ। এই দোয়া এই কারণে শেখানো হয়েছে যাতে মানুষ প্রবল উৎসাহে এর দ্বারা স্রষ্টার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারে। সেই উদ্দেশ্য হল এই যে, এই জাতি যেন পশুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত না করে, বরং তিনি তাদের পথের যাবতীয় বাধাবিপত্তি দূরীভূত হতে দেখতে চান। যেরূপ শিয়াদের আকিদা হল বারো জন ইমামের পর ওলীর পদমর্যাদা লাভের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ এই দোয়া থেকে একথাই প্রতিভাত হয় যে, খোদা নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে মুত্তাকি হবে, খোদার অভিপ্রায় অনুসারে চলবে সে সেই সব মর্যাদা লাভ করবে যা আম্বিয়া ও সুফিগণ লাভ করে থাকেন। এর থেকে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অনেক শক্তি ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে যেগুলিকে তাকে বিকশিত করে তুলতে হবে। একটি ছাগলের সঙ্গে যেহেতু মানুষের তুলনা হয় না, তাই তার শক্তিবৃত্তি সেভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে না। একজন পরম উৎসাহী ব্যক্তি যখন নবী ও আম্বিয়াদের জীবনী অধ্যয়ন করে দেখে যে তারা কোন কোন পুরস্কার লাভ করেছে, তখন সে কেবল সেগুলির উপর ঈমান স্থাপন করাতেই সন্তুষ্ট থাকেনা, বরং এগুলি থেকে অংশ নেওয়ার বাসনাও তার মনে জাগ্রত হয়, প্রথমত অনুমান ভিত্তিক জ্ঞানলাভের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত চাক্ষুস করার মাধ্যমে এবং অবশেষে স্পর্শ করে হৃদয়াঙ্গম করার মাধ্যমে।

জ্ঞানের তিনটি পর্যায়

প্রথম ধাপটি হল অনুমান ভিত্তিক জ্ঞান। দ্বিতীয়টি হল চাক্ষুস জ্ঞান এবং তৃতীয়টি হল অবশ্যম্ভাবিতা। যেমন, কোন স্থান থেকে ধুঁয়ার উৎপত্তি দেখে আগুনের অনুমান করা হল অনুমান ভিত্তিক জ্ঞান বা ‘ইলমুল ইয়াকিন’। কিন্তু স্বচক্ষে আগুন দেখা চাক্ষুস জ্ঞান বা ‘আইনুল ইয়াকিন’-এর পর্যায়ভুক্ত। এর থেকে উন্নত পর্যায় হল ‘হাক্কুল ইয়াকিন’-এর। অর্থাৎ আগুনে হাত দিয়ে এর দহন ও উত্তাপ অনুভব করে বিশ্বাসের সেই পরম মার্গে উপনীত হওয়া যে সত্যিই আগুন আছে। অতএব সেই ব্যক্তি কতই না হতভাগা যে, এই তিনটি মর্যাদার মধ্যে কোনওটিই লাভ করল না। এই আয়াত অনুসারে যার উপর আল্লাহ্‌র কৃপা বর্ষিত হয় নি, সে অন্ধ অনুকরণে নিমগ্ন রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আন কাবুত, আয়াত: ৭০)

যে ব্যক্তি আমার পথে সংগ্রাম ও সাধনা করবে, আমরা তাকে আমাদের পথ দেখাব। একদিকে এই প্রতিশ্রুতি আর অপরদিকে এই দোয়া- ‘এহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম’। অতএব এটিকে দৃষ্টিপটে রেখে মানুষের উচিত নামাযে ব্যকুল হয়ে দোয়া করা। এবং বাসনা করা উচিত সে সেই সমস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যারা উন্নতি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন। পাছে সে ইহজগত ত্যাগ করার মূহুর্তে অন্তর্দৃষ্টি ও দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে উত্থিত হয় আর পরকালেও

এরপর শেষের পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্য হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

(পূর্বের সংখ্যার পর)

এখানে জার্মানীতে কয়েকটি সংগঠন আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় আর আমাদেরকে নতুন মসজিদ নির্মাণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, অথচ 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-এই নীতি নিয়ে আমরা চলি। বিগত এক শত ত্রিশ বছর থেকে আমাদের জামাত সারা পৃথিবীতে ভালবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রসারে অগ্রণী। আমাদের ইতিহাস সাক্ষী আছে, যখনই আমরা নতুন কোন মসজিদ নির্মাণ করেছি, বা কোথাও আমাদের নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে শীঘ্রই প্রতিবেশীদের ভীতি দূর হয়েছে। যারা পূর্বে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত, তারা আমাদের একনিষ্ঠ বন্ধু ও জামাতের শুভাকাঙ্খীতে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বে আমাদের প্রতিবেশীরা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আহমদীরা সমাজে শান্তির প্রচারক। এরা পৃথিবীতে শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতার সেবার বাণী প্রচার করে। কিন্তু অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বের শোচনীয় পরিস্থিতির কারণে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকেও এর ফল ভোগ করতে হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন- দেশহারাদেরকে এরা নিজেদের দেশে ব্যাপকহারে প্রবেশের বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণেও করে যে, নারীদের যৌন-নিগ্রহ করার প্রতি শরণার্থীদের বেশি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে একটি ইউরোপীয় দেশে মহিলাদের যৌন-হয়রানির ঘটনা বা এর চেষ্টায় জড়িত ব্যক্তিদের অধিকাংশের সম্পর্ক শরণার্থীদের সঙ্গে। এই পরিসংখ্যন কতদূর সত্য, সেকথা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই জানেন। কিন্তু যখন রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়, তখন তা অন্যান্য জাতিকেও প্রভাবিত করে আর এর পরিণামে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ভীতি ও আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আরও একটি বিষয় যার উপর অনেক রাজনৈতিক দল ও নেতারা জোর দেন, সেটি হল এই সব দেশহারা মানুষদেরকে সামলাতে, তাদের থাকা ও খাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশকে অনেক সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে। এরফলে সরকারের উপর চাপ বাড়ছে। ফলে স্থানীয় করদাতারা প্রভাবিত হয়। কোন দেশের করদাতা নাগরিকের এই প্রশ্ন করা যথোচিত যে, তাদের করের টাকা তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রকল্পে ব্যয় না করে ভিনদেশী শরণার্থীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ব্যায় করা ঠিক? আমি এই বিতর্কে যাব না যে, এটি প্রধান সমস্যা কিনা বা সমস্যার মূল কারণ কি না? কিন্তু এর সমাধান সূত্র বার করতে যদি না বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া হয়, তবে সমাজে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। যখন বিপুল সংখ্যক শরণার্থী হিজরত করে আসে, তখন সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শরণার্থীদের মধ্যেও এমন কিছু অপ্রকাশ্য উপাদান অবশ্যই থাকে যা প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন, সম্প্রতি জার্মানীতে বসবাসকারী এক মহিলা শরণার্থীর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। এই ভদ্রমহিলাকে ইরাকে অপহরণ করে দাসী বানিয়ে রাখা হয়েছিল। তার কথা থেকে জানা যায় যে, সে কতটা সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয় যখন দেখে যে তাকে অপহরণকারী ব্যক্তিও জার্মানীতে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে। আর সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সেই সদস্য অত্যাচারিত ও নিপীড়তদের বেশে জার্মানীতে প্রবেশ করেছে। এটি সেই বিষয় যা সম্পর্কে আমি পূর্বেই সতর্ক করেছি। এই জন্য আমি বলি, প্রত্যেকটি বিষয়কে আলাদাভাবে তদন্ত করা হোক এবং উগ্রবাদীরা যাতে শরণার্থীদের বেশে কোনওক্রমেই প্রবেশ করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করা হোক।

হুযুর আনোয়ার বলেন-

যাইহোক, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলিম দেশগুলি থেকে ব্যপকহারে মানুষের পলায়ন ও দেশত্যাগ করার আতঙ্ক কিছুটা হলেও সঙ্গত। কিন্তু একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান মানুষের উচিত ছবির দুই পৃষ্ঠা ভালকরে দেখা এবং মুসলমান ও ইসলাম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করা। কোন ব্যক্তি কেবল এই কারণে ইসলামকে উগ্রবাদের ধর্ম বলে বা দাবি করে যে, সমস্ত মুসলমান সন্ত্রাসবাদী, তবে তার দাবির কোন সত্যতা নেই। বরং যাবতীয় সত্যনিষ্ঠ বিষয়কে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পূর্ণরূপে যাচাই করে দেখা উচিত। অতএব ইসলামের শিক্ষা উগ্রবাদের উপাদান রাখে-এমন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে সত্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে দেখা কর্তব্য। যাচাই করে দেখুন যে, মুষ্টিমেয় তথাকথিত মুসলমানদের অপকর্ম সতিই কি ইসলামের শিক্ষার কারণে? চিন্তা করে দেখুন যে, সত্যিই কি ইসলাম উগ্রবাদের অনুমতি দেয় নাকি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে যারা সমাজে বিদ্বেষাগ্নি ছড়ায়? ইসলাম কি ধর্মের নামে মুসলমানদের দেশীয় আইন লঙ্ঘন করার অনুমতি দেয়? ইসলাম মুসলমানদের কাছে সামাজিক সৌজন্যের বিষয়ে কি প্রত্যাশা রাখে? ইসলাম কি এই শিক্ষা দেয় যে, দেশের বোঝা হয়ে থাক? নাকি পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করে এবং দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সমাজের উন্নতির জন্য গঠনমূলক ভূমিকা পালন করার শিক্ষা দেয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন- যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত মুসলমান অপকর্মে লিপ্ত তারা ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একাজ করে তবে হয়তো একথা বলা যেত যে দক্ষিণপন্থীদের আশঙ্কা সত্যি। কিন্তু যদি এমন তথাকথিত মুসলমানদের জীবনযাপন ও কর্মধারা দ্বারা ইসলামের সঙ্গে দূরতম সম্পর্কও প্রমাণিত না হয়, তবে এটি কিভাবে সঠিক বলা যাবে? যদি একথা প্রমাণ হয় যে, ইসলাম বিরোধী দলগুলি কেবল বিদ্বেষপূর্ণ বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে, যেগুলি কোনওটিই সত্যনির্ভর নয়, বরং কল্পনাপ্রসূত, তবে এর দায় কার? এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করব। আশা করি এর দ্বারা আপনাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পেতে সহায়তা হবে আর আপনারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার নির্যাস হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- ইসলামের মৌলিকনীতি হল, মানুষ যখন শান্তিতে থাকে তখন অপরের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ প্রায়শই সেই সমস্ত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে যা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে সংঘটিত হয়েছিল। এর দ্বারা তারা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ইসলাম এক রক্তক্ষয়ী ধর্ম যা (ধর্মের বিষয়ে) বলপ্রয়োগের অনুমতি দেয়। অথচ সত্য এই যে, মুসলমানরা প্রারম্ভিক তেরো বছর অনবরত অমানবিক ও নির্মম উৎপীড়ন সহ্য করেছে, কিন্তু তারা কোনও প্রত্যাঘাত করে নি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আত্মরক্ষার অনুমতি প্রদান করেন। এই অনুমতির উল্লেখ কুরআন মজীদের সূরা হজ্জের ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে করা হয়েছে যা আমার বক্তব্যের পূর্বে এখানে তেলাওয়াত করা হয়েছে। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই সমস্ত মানুষকে যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং ঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তাদেরকে আর যেন অত্যাচারিত না হতে হয় সেই জন্য আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হল। অধিকন্তু কুরআন মজীদ বর্ণনা করে যে, যদি মুসলমানেরা নিজেদের ধর্মের উপর হওয়া আক্রমণ প্রতিহত না করত, তবে কালিসা, মন্দির, উপাসনাগার, মসজিদ এবং সমস্ত ইবাদতগাহও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। এই কারণেই এই অনুমতি সেই সমস্ত মানুষের অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য যাতে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করতে পারে। কুরআন মজীদের সূরা ইউনুসের ১০১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সম্বোধন করে বলেন, যদি তিনি চাইতেন তবে নিজের ইচ্ছা সকলের উপর চাপিয়ে দিতে পারতেন আর সমগ্র মানবজাতিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে সূরা কাহাফের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে নিজেদের বাণী প্রচার করা উচিত এবং এই ঘোষণা দেওয়া উচিত যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। কিন্তু সঙ্গে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকে স্বাধীন, সে স্বীকার করুক বা প্রত্যাখ্যান করুক। কুরআন মজীদের আয়াত বলছে, ঈমান আনা বা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে মানুষ স্বাধীন। অনুরূপভাবে কুরআন করীম সেই সমস্ত অমুসলিমদের বিষয়ে ইঙ্গিত করছে যারা স্বীকার করে যে ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ও অনুগ্রহশীল ধর্ম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমান আনতে অস্বীকার করে। কেননা তারা মনে করে, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পথ অবলম্বন করলে তাদের জাগতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদের সূরা কাসাসের ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের দাবি, যদি তারা তোমার নির্দেশের অনুসারী হয় তবে নিজভূমি থেকে বিতাড়িত হবে।

ইসলামের এই প্রকৃত শিক্ষার দাবি হল মানুষ যেন সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে এবং এর উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যে সমস্ত মুসলমান জিহাদের দাবি করে, সেটিকে তারা অমুসলিমদের উপর আক্রমণই হোক বা তাদেরকে জোর করে মুসলমান বানানোকে বোঝাক-এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভ্রান্ত। এমন কর্মধারা ও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।

(ক্রমশঃ.............)

জুমআর খুতবা

“ বস্তুতঃ, তাঁর সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা থেকে তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন।

ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদতের মহান মর্যাদালাভকারী বদর সাহাবী হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবা (রা.)-এর জীবনালেখ্য সম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা।

খিলাফতে আহমদীয়ার গভীর অনুরাগী, অনুগত, বিনয়ী দীর্ঘকাল জামাতের সেবাদানকারী বুযুর্গ প্রফেসর মাসউদ আহমদ খান সাহেবের মৃত্যু। তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১লা ফেব্রুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১ তবলীগ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকে যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবা। তার ডাকনাম ছিল আবু হুযায়ফা। তার নাম হুশায়ম বা হাশেম বা কায়েস, কিসল আর মিকসামও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তার মা ছিলেন উম্মে সাফওয়ান। তার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে সাফওয়ান। তিনি দীর্ঘকায় ও সুশ্রী চেহারার অধিকারী ছিলেন। মহানবী (সা.) এর দ্বারে আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬১-৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮, হাদীস-৪৯৯৩,দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২) (আমতাউল আসমা, খণ্ড-১৪, পৃ: ৩৫৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৯) তিনি প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে,

‘আবু হুযায়ফা বিন উতবা বনু উমাইয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল উতবা বিন রাবিয়া। তিনি কুরাইশ নেতাদের একজন ছিলেন। আবু হুযায়ফা ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন, যা হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে মুসায়লামা কাযযাব এর বিরুদ্ধে লড়া হয়েছিল।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত-সীরাত খাতামাননাবীঈন, পৃ: ১২৪)

হযরত আবু হুযায়ফা ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতে অংশ নিয়েছেন। তার স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহায়লও তার সাথে হিজরত করেছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হাবশার হিজরত কিভাবে এবং কেন হলো, সাহাবাদের স্মৃতিচারণে পূর্বেও তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং হাদীস গ্রন্থ থেকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যা সংকলন করেছেন, তা আরো সংক্ষিপ্ত রূপে বা তা থেকে কয়েকটি কথা নিয়ে আমি বর্ণনা করব। তিনি লিখেন, মুসলমানদের কষ্ট যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, আর কুরাইশদের নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, ইথিওপিয়ার বাদশা ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক, তার রাজত্বে কারো প্রতি অবিচার করা হয় না। সে যুগে ইথিওপিয়া একটি শক্তিশালী খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য ছিল। সেখানকার বাদশাহ্র উপাধী ছিল নাজ্জাশী। ইথিওপিয়ার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মুসলমানরা যখন হিজরত করে, সে সময়কার বাদশাহ্র নিজের নাম ছিল আসহামাহ, যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, বিবেকবান এবং শক্তিশালী বাদশাহ্ ছিলেন। যাহোক মুসলমানদের কষ্ট যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন ইথিওপিয়ায় হিজরত করে। মহানবী (সা.) এর নির্দেশে পঞ্চম হিজরীর রজব মাসে ১১জন পুরুষ এবং ৪জন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করে। তাদের মাঝে অধিক পরিচিত নামগুলো হলো- হযরত উসমান বিন আফফান এবং তার সহধর্মিণী রসূল (সা.) এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা, আব্দুর রহমান বিন অউফ, যুবায়ের বিন আল আউয়াম, আবু হুযায়ফা বিন উতবা, এখন যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে- ইনিও প্রথম হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উসমান বিন মাযঊন, মুসআব বিন উমায়ের, আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ এবং তার স্ত্রী উম্মে সালামা।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, আশ্চর্যের বিষয় হলো- প্রথমিক যুগে হিজরতকারীদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি তাদের ছিল যারা কুরাইশের শক্তিশালী গোত্রগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখতেন, আর দুর্বল কমই চোখে পড়ে। এ থেকে দুটি বিষয় জানা যায়। প্রধানত শক্তিশালী গোত্রের অন্তর্ভুক্তরাও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত দুর্বল অর্থাৎ কৃতদাস ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণি এতই দুর্বল ও অসহায় ছিল যে, তারা হিজরতের সামর্থ্যও রাখতো না। এই মুহাজেররা দক্ষিণ দিকে সফর করে যখন সুআয়বা পৌঁছে, যা সে যুগে আরবদের একটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল, তখন খোদার এমন কৃপা হয় যে, তারা একটি বাণিজ্যিক জাহাজ পেয়ে যায় যা ইথিওপিয়া অভিমুখে যাত্রার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। তারা সেই জাহাজে আরোহন করে। ইথিওপিয়া পৌঁছে মুসলমানরা খুবই শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনে ধন্য হয়। আল্লাহ্র কৃপায় কুরাইশদের নির্যাতন থেকে নিস্তার লাভ হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই মুহাজেরদের ইথিওপিয়া যাওয়ার স্বল্পকাল পরেই তাদের কাছে এই উড়ো খবর পৌঁছে যে, সব কুরাইশ মুসলমান হয়ে গেছে, আর মক্কা এখন শান্তিধামের রূপ নিয়েছে। এই খবরের ফলে বেশিরভাগ মুহাজের অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই ফিরে আসে।

এই গুজব কীভাবে এবং কেন ছড়িয়ে পড়লো বা এর কারণ কী ছিল? সে সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব কিছুটা আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ গবেষণা করে তিনি বলেন, যদিও বাস্তবে এই গুজব সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ছিল, যা ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের ফিরিয়ে আনা এবং কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুরাইশরা-ই ছড়িয়ে থাকবে। বরং গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই গুজব এবং মুহাজেরদের ফিরে আসার পুরো কাহিনী ভিত্তিহীন মনে হয়। (তিনি লেখেন) কিন্তু এটিকে সঠিক ধরে নেওয়া হলেও হয়ত এর অন্তরালে সেই ঘটনা অন্তর্নিহিত থাকবে যা কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেই ঘটনা, যেমনটি কিনা বুখারীতেও উল্লিখিত আছে যে, একবার মহানবী (সা.) কাবা-চত্বরে সূরা নজমের আয়াত তিলাওয়াত করেন। তখন সেখানে কাফেরদের বেশ কিছু নেতা উপস্থিত ছিল, আর ছিল কতক মুসলমান। তিনি (সা.) সূরা নজম শেষ করার পর সেজদা করেন। সব মুসলমান এবং কাফেরও তাঁর (সা.) সাথে সেজদাবনত হয়। কাফেরদের সেজদা করার কারণ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। কিন্তু মনে হয় মহানবী (সা.) যখন খুবই প্রভাব বিস্তারী কণ্ঠে আল্লাহ্ তা'লার আয়াত তিলাওয়াত করেন, আর সেই আয়াতগুলোও এমন ছিল যাতে বিশেষভাবে খোদার একত্ববাদ, তাঁর শক্তিমত্তা এবং পরাক্রম অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু তাঁর অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করানো হয়েছে, আর অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ও প্রতাপান্বিত বাণীতে কুরাইশকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যদি নিজেদের দুর্বৃত্তি থেকে বিরত না হয় তাহলে

তাদের পরিণতি তা-ই হবে যা তাদের পূর্ববর্তীদের হয়েছিল, যারা আল্লাহ্ তা'লার রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। শেষের দিকে এই আয়াতগুলোতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আস, আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হও। আর এই আয়াতগুলো তিলাওয়াতের পর মহানবী (সা.) এবং সব মুসলমান তাৎক্ষণিকভাবে সেজদাবনত হয়। এই বাণী এবং এই দৃশ্যের কুরাইশদের ওপর এমন জাদুময় প্রভাব পড়ে অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে, তারাও মুসলমানদের সাথে অবলীলায় সেজদাবনত হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, এটি কোন আশ্চর্যজনক বিষয় নয়, কেননা এমন পরিস্থিতিতে, যা বর্ণিত হয়েছে, অনেক সময় মানব হৃদয় প্রতাপান্বিত হয়ে যায়। আর সে অবলীলায় এমনটি করে বসে যা সত্যিকার অর্থে তার নীতি এবং বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়ে থাকে। যেমন আমরা দেখেছি যে, অনেক সময় কঠিন এবং আকস্মিক পরিস্থিতির অধীনে এক নাস্তিকও আল্লাহ্ আল্লাহ্ বা রাম রাম জপতে থাকে। কুরাইশরা তো নাস্তিক ছিল না, বরং তারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখতো। যদিও তারা মূর্তি-প্রতিমাকে আল্লাহর শরীক আখ্যা দিত। অধুনাকালেও আমরা দেখি যে, অনেক নাস্তিকের সাথে কথা হয়, যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমরা কোন আকস্মিক পরিস্থিতির শিকার হলে আল্লাহর কথা কি তোমাদের মনে পড়ে? তখন তারা স্বীকার করে যে, হ্যাঁ, মনে পড়ে। যাহোক এটি সেই সূরা পড়ার বা সূরার আয়াতগুলোর এবং মুসলমানদের আচরণের একটি প্রভাব ছিল যার ফলে কাফেরদের নেতারাও একইসাথে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

যাহোক মুসলমানরা সমবেতভাবে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে যার এমন জাদুকরী প্রভাব পড়ে যে, কুরাইশরাও তাদের সাথে অবলীলায় সেজদাবনত হয়। কিন্তু এমন প্রভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাময়িক হয়ে থাকে আর মানুষ খুব দ্রুতই নিজেদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। অতএব কাফেররাও পূর্বের অবস্থার ফিরে যায়, অর্থাৎ তাদের অবস্থাও এমনই হয়ে যায়। যাহোক এটি একটি ঘটনা যা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত আর বুখারীতেও এটি লিপিবদ্ধ আছে। অতএব ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের ফিরে আসার সংবাদ যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এমন মনে হয় যে, এই ঘটনার পর কুরাইশরা, যারা ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের ফেরত আনার জন্য উদগ্রীব ছিল যে, তারা কেন চলে গেল, আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল, নিজেদের এই কাজকে পুঁজি করে হয়ত নিজেরাই এই গুজব ছড়িয়ে থাকবে যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেছে বা মক্কা মুসলমানদের জন্য এখন সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ। ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের কাছে যখন এই গুজব পৌঁছে, স্বভাবতই তারা এটি শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে থাকবে। আর তা শুনতেই আনন্দে আপ্লুত হয়ে চিন্তাভাবনা না করেই ফিরে এসে থাকবে। কিন্তু তারা যখন মক্কার কাছে পৌঁছল তখন সত্য জানা গেল আর বাস্তবতা সম্পর্কে তারা অবহিত হলো। তখন তাদের কতক গোপনে আর কতক কিছু শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী কুরাইশ নেতার আশ্রয় ও নিরাপত্তায় মক্কায় এসে যায়। আর কিছু ফিরে যায়। অতএব কুরাইশদের মুসলমান হওয়া সংক্রান্ত গুজবে যদি কোন সত্য থেকে থাকে তাহলে তা কেবল ততটাই ছিল যতটা সূরা নজমের তিলাওয়াতের পর সিজদা সংক্রান্ত ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। যাহোক আল্লাহই ভালো জানেন।

যাহোক ইথিওপিয়ার মুহাজেররা ফিরে আসলেও তাদের অধিকাংশই আবার ফিরে যান, কেননা কুরাইশরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নিপীড়নে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। আর তাদের নির্যাতনও প্রত্যহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই মহানবী (সা.) এর নির্দেশে অন্যান্য মুসলমানরাও সংগোপনে হিজরতের প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করে। আর সুযোগ বুঝে তারা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে থাকে। এই হিজরত এমনভাবে আরম্ভ হয় যে, অবশেষে ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা ১০০ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যাদের মাঝে ১৮জন মহিলাও ছিল। আর মক্কায় মহানবী (সা.) এর সাথে খুব স্বল্পসংখ্যক মুসলমান রয়ে যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক এই হিজরতকে ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরত নামে অভিহিত করে থাকে।

(মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৪৬-১৪৯)

অর্থাৎ প্রথমে একটি হিজরত হয়েছে এরপর দ্বিতীয়টি। একইভাবে পরবর্তীতে যখন মদীনায় হিজরতের অনুমতি লাভ হয়, তখন আবু হুযায়ফা এবং তার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম উভয়েই মদীনায় হিজরত করেন। প্রথমে তারা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন আর সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং এরপর মদীনায় দ্বিতীয় হিজরত করেন, যেখানে তারা উভয়েই আব্বাদ বিন বিশরের ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.)হযরত আবু হুযায়ফা এবং আব্বাদ বিন বিশরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত আবু হুযায়ফা আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ নামক সারিয়া বা যুদ্ধাভিযানেও যোগদান করেছেন।

(সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃ: ২৮৬, দার ইবনে হাজাম দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ-এর সারিয়া বা যুদ্ধাভিযানের পটভূমি এবং কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এখন সেটি উপস্থাপন করছি। মক্কার এক নেতা কুরয বিন জাবের বিন ফেহরী কুরাইশদের একটি সৈন্যদলের সাথে চরম ধূর্ততার সাথে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী একটি চারণভূমিতে আকস্মিকভাবে হামলা করে আর মুসলমানদের উট বা গবাদিপশু লুটপাট করে পালায়। এর সংবাদ পেতেই মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসাকে তাঁর (সা.) অবর্তমানে আমীর নিযুক্ত করে মুহাজেরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন আর বদরের অদূরবর্তী একটি জায়গা সাফওয়ান পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু সে হাত ফসকে বেরিয়ে যায়। এই যুদ্ধকে 'গাযওয়ায়ে বদর আলউলা' (অর্থাৎ বদরের প্রথম যুদ্ধ) বলা হয়। তিনি আরো লিখেন যে, কুরয বিন জাবের-এর এই হামলা কোন মরুবাসীর বিচ্ছিন্ন হামলা ছিল না বা অজ্ঞতাবশত শুধু চুরি-ডাকাতির মানসে হামলা ছিল না, বরং সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ থেকে বিশেষ দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছিল। এটি একেবারেই অসম্ভব নয় যে, বিশেষত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার ওপর হামলা-ই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসলমানদেরকে সজাগ ও সতর্ক পেয়ে সে তাদের উট নিয়ে পালিয়ে যায়। এর মাধ্যমে এটিও বুঝা যায় যে, কুরাইশরা মদীনায় গোপন হামলার মাধ্যমে মুসলমানদের ধ্বংস করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল।

কুরয বিন জাবের এর আকস্মিক হামলা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদেরকে খুবই ভীতবিহ্বল এবং হতভম্ব করে তোলে। আর কুরাইশ নেতাদের হুমকি-ধমকি যেহেতু পূর্বেই ছিল যে, আমরা মদীনায় হামলা করব আর মুসলমানদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করব, তাই মুসলমানরা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এসব আশঙ্কা দেখে মহানবী (সা.) কুরাইশদের গতিবিধি খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে মনঃস্থির করেন। দেখা যাক তাদের পরিকল্পনা কী আর দুরভিসন্ধি কী। আর তা উদঘাটনের জন্য এমন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া উচিত যেন খুব কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে খবরাখবর আসতে থাকে এবং সময়মত সংবাদ লাভ হয়। আর মদীনার ওপর যে কোন হামলা হওয়া থেকে যেন একে নিরাপদ রাখা যায়। এই লক্ষ্যে তিনি (সা.) ৮জন মুহাজেরের সমন্বয়ে একটি সেনাদল প্রস্তুত করেন। আর কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই সেনাদলে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতো। যেন কুরাইশের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়। তিনি (সা.) নিজের পিসতুতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে এই সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেন। এই সেনাদলে হুযায়ফা বিন উতবাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সাধারণ মুসলমানরা যাতে এই সেনাদলের উদ্দেশ্য জানতে না পারে এই লক্ষ্যে তিনি (সা.) এই সেনাদল প্রেরণের পূর্বে সেনাদলের আমীরকেও বলেন নি যে, কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রেরণ করা হচ্ছে। বরং যাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাদের হাতে একটি বন্ধ খাম ধরিয়ে দেন। আর বলেন যে, এই চিঠিতে তোমাদের জন্য দিক-নির্দেশনা রয়েছে। সেই সাথে আরো বলেন, তোমরা যখন মদীনা থেকে অমুক দিকে দুদিনের দূরত্ব অতিক্রম করবে তখন এই পত্র খুলে পত্রে

ইমামের বাণী

" আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে ও পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়।"

(ফতেহ ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৩২-৩৩)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া
আমাইপুর, বীরভূম

এতে বর্ণিত দিক-নির্দেশনা অনুসারে ব্যবস্থা নিবে। আব্দুল্লাহ্ এবং তার সাথিরা তাদের মনীবের নির্দেশে যাত্রা করেন। দুদিনের সফর অতিক্রম করার পর আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.) এর পত্র খুলে দেখেন। তাতে এই কথা লিপিবদ্ধ ছিল যে, তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা উপত্যকায় যাও। সেখানে গিয়ে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহ কর আর আমাদেরকে অবহিত কর। যেহেতু মক্কার এতটা কাছে থেকে খবর সংগ্রহ করা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যাপার ছিল তাই তিনি (সা.) পত্রের শেষের দিকে এই দিক-নির্দেশনাও লিখে দিয়েছিলেন যে, এই মিশন সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তোমার কোন সাথি যদি এই সেনাদলের অংশ হতে দ্বিধা করে এবং সে যদি ফিরে আসতে চায় তাহলে তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিবে। আব্দুল্লাহ্ তার সাথিদেরকে মহানবী (সা.) এর দিক-নির্দেশনা শুনিয়ে দেন। তখন সবাই সমস্বরে ও সানন্দে এই সেবার জন্য আত্মনিবেদন করে এবং বলে যে, আমরা উপস্থিত।

অতঃপর এই সেনাদল নাখলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সাদ বিন আবি ওক্কাস এবং উতবা বিন গাযওয়ান-এর উট হারিয়ে যায়, তারা এর সন্ধানে নিজ সাথিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অনেক সন্ধান করেও তাদেরকে পাওয়া যায় নি। এখন এটি কেবল ছয় সদস্যের একটি সেনাদল হয়ে যায়। এই ছয় ব্যক্তি নিজেদের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে থাকে। মুসলমানদের এই ছোট্ট জামাতটি নাখলা পৌঁছে আর নিজেদের কাজে রত হয়, অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের অভিপ্রায় কী, মদীনায় হামলা করার কোন দুরভিসন্ধি আছে কিনা, বা কী ষড়যন্ত্র করছে- তা জানার কাজে রত হয়। তাদের কেউ কেউ গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে মাথার চুল কামিয়ে ফেলে, যেন পথিকরা একথা মনে করে সন্দেহন না করে যে এরা উমরাহ্-র উদ্দেশ্যে এসেছে। অর্থাৎ তারা যেন এটি মনে করে যে, এরা উমরাহ্-র জন্য যাচ্ছে।

কিন্তু বলা হয় যে, তাদের সেখানে পৌঁছার পর কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই, হঠাৎ সেখানে কুরাইশদেরও একটি ছোট্ট কাফেলা পৌঁছে যায়, যারা তায়েফ থেকে মক্কা যাচ্ছিল আর উভয় দল মুখোমুখি হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন তারা জানতে পারে যে, এরা মুসলমান তখন এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। এই মূহুর্তে কি করণীয় সে সম্পর্কে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, কেননা মহানবী (সা.) তাদেরকে গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে ইতিমধ্যেই যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে আর এখন দুই শত্রুদল মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। এছাড়া স্বভাবতই এই আশঙ্কাও ছিল যে, কুরাইশ কাফেলা যেহেতু মুসলমানদের চিনে ফেলেছে তাই এই খবর সংগ্রহের বিষয়টিও আর গোপন থাকবে না। সেই সাথে আরেকটি সমস্যা এটিও ছিল যে, কিছু মুসলমানের ধারণা ছিল, এটি রজব মাসের দিন (অর্থাৎ পবিত্র মাসগুলোর শেষ দিন) যে পবিত্র মাসগুলোতে আরবের রীতি অনুসারে যুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল না। কেউ কেউ মনে করত যে, রজব মাস ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে আর শাবান আরম্ভ হয়ে গেছে। আর কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল জমাদিউল আখের-এ। আর এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল যে, এ দিনটি কি রজবের নাকি জমাদিউল আখের এর। পক্ষান্তরে নাখলা উপত্যকা একান্ত হারাম শরীফের সীমানায় অবস্থিত ছিল। স্পষ্টতই আজই যদি কোন সিদ্ধান্ত না হয় তাহলে কাল এই কাফেলা হারামে প্রবেশ করবে। যার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক।

এক কথায় এসব কথা চিন্তা করে সেই ছয়জন মুসলমান এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, কাফেলার ওপর হামলা করে হয় তাদেরকে বন্দি করা উচিত অথবা হত্যা করা উচিত। অতএব তারা আল্লাহর নাম নিয়ে হামলা করে। ফলশ্রুতি স্বরূপ আমের বিন আলহাজরামি নামক কাফেরদের এক ব্যক্তি মারা যায় আর দুজন বন্দী হয়। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তি হাত ফস্কে বেরিয়ে যায়। মুসলমানরা তাকে বন্দি করতে পারে নি। আর এভাবে তাদেরকে হত্যা করা বা বন্দি করার এই প্রস্তাব সফল হয়েও হলো না। এরপর মুসলমানরা কাফেলার সাজসরঞ্জামের দখল নেয়। কুরাইশদের একজন যেহেতু প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়। আর এটি নিশ্চত ছিল যে, এই সংঘর্ষের সংবাদ অচিরেই মক্কায় পৌঁছে যাবে, তাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং তার সাথিরা গনিমতের মাল নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

প্রাচ্য বিশাদরাও এ সম্পর্কে আপত্তি করে যে, দেখ পরিকল্পিতভাবে এই সেনাদল পাঠানো হয়েছে আর জেনেশুনে কাফেলাতে হামলা করানো হয়েছে, এটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত কথা। যাহোক সত্য কথা হলো মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন যে, সাহাবীরা কাফেলার ওপর হামলা করেছে, তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন। ঘটনার বর্ণনা অনুসারে যখন এই দলটি মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয় আর তিনি যখন পুরো বৃত্তান্ত অবগত হন তখন তিনি খুবই অন্তুষ্ট হন এবং বলেন যে, আমি তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দিই নি। এমনকি তিনি (সা.) গনিমতের মাল নিতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি (সা.) বলেন যে, এটি থেকে আমি কিছুই নিব না। এতে আব্দুল্লাহ্ এবং তার সাথিরা যারপরনাই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। তারা ধরে নেন যে, আমরা খোদা এবং তাঁর রসূলের অসন্তুষ্টির ফলে এখন ধ্বংস হয়ে গেছি। তাদের হৃদয়ে গভীর ভীতি জাগে। মদীনায় অবস্থিত সাহাবীরাও তাদেরকে কঠোর ভর্ৎসনা করেন যে, তোমরা সেই কাজ করেছ যার নির্দেশ তোমাদের দেওয়া হয়নি। তোমরা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করেছ, অথচ এই অভিযানে তোমাদেরকে আদৌ যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

অপরদিকে কুরাইশরাও হৈচৈ আরম্ভ করে যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছে। আর যে ব্যক্তি মারা গিয়েছিল অর্থাৎ আমর বিন হাযরামি, সে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। এছাড়া সে মক্কার নেতা উতবা বিন রাবিআ-র মিত্রও ছিল। এই কারণেও এই ঘটনা মক্কার কুরাইশদের ক্রোধাগ্নিকে আরও উস্কে দেয়। তারা নবোদ্যমে মদীনার ওপর হামলার প্রস্তুতি আরম্ভ করে। যাহোক এই ঘটনায় মুসলমান এবং অবিশ্বাসীদের মাঝে অনেক বাদানুবাদ হয় এই কারণে যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসে হামলা করেছে। সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন-

অবশেষে নিম্নলিখিত কুরআনী আয়াত নাযেল হয়ে মুসলমানদের স্বস্তির কারণ হয়।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا (البقرة:218)

(সূরা বাকারা: ২১৮)

অর্থাৎ মানুষ তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি তাদের উত্তর দাও যে, নিঃসন্দেহে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত অপছন্দনীয় বিষয়, কিন্তু পবিত্র মাসে মানুষকে আল্লাহর ধর্ম থেকে জোরজবরদস্তিমূলকভাবে বিরত রাখা, আর পবিত্র মাস এবং মসজিদে হারাম উভয়টির কুফর অর্থাৎ এগুলোর সম্মানকে পদদলিত করা, আর এরপর হারাম থেকে এর অধিবাসীদের বাহুবলে বহিষ্কার করা, যেমনটি কিনা হে মুশরিকরা! মুসলমানদের বহিষ্কার করে তোমরা করছ, এসব কিছু খোদার দৃষ্টিতে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা থেকে বেশি অপছন্দনীয়। নিশ্চয় পবিত্র মাসে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা সেই হত্যা থেকে ঘৃণ্য যা নৈরাজ্যকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য করা হয়। হে মুসলমানরা কাফেরদের অবস্থা হলো তোমাদের শত্রুতায় তারা এতটা অন্ধ যে, যেকোন স্থানে যেকোন সময় তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবে না। আর তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে, যদি তাদের জন্য সম্ভব হয়।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতারা নিজেদের হিংস্র অপপ্রচারকে পবিত্র মাসেও যথারীতি চালিয়ে যেতো। বরং এ মাসগুলোর ইজতেমা বা সম্মেলন এবং সফরকে কাজে লাগিয়ে তারা এসব মাসে নৈরাজ্যপূর্ণ কার্যকলাপে আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠতো। এছাড়া চরম নির্লজ্জতার প্রমাণ দিয়ে মিথ্যা আত্মপ্রসাদ নিয়ে সম্মানিত মাসগুলোকে আগেপিছে স্থানান্তরিত করতো, যাকে তারা 'নাসী' আখ্যায়িত করতো। মুসলমানদের সাথে তারা মক্কা বিজয় পর্যন্ত এই ব্যবহার অব্যাহত রাখে, বরং এ ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই শব্দ ব্যবহার করেছেন যে, তারা পুরোপুরি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির বর্তমানে পাকা কথা ও চুক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার কাফের এবং তাদের সাথিরা হারাম এর অভ্যন্তরে মুসলমানদের এক মিত্র গোত্রের বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করে আর মুসলমানরা যখন সেই গোত্রের সমর্থনে বের হয় তখন তাদের বিরুদ্ধেও হারামের ভিতরেই তরবারি চালায়। অতএব এই উত্তরে, যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন, তার দ্বারা মুসলমানরা তো স্বস্তি পাওয়ার ছিলই, কুরাইশরাও কিছুটা বিরত হয়।

আর এরই মাঝে তাদের লোকেরা নিজেদের দুই জন বন্দিকে মুক্ত করানোর জন্য মদীনায় পৌঁছে যায়। অভিযানে বের হওয়া মুসলমানরা যে দুইজন বন্দি নিয়ে এসেছিল, অর্থাৎ কাফেলার যে দুইজনকে বন্দি করা

হয়েছিল (তাদের কথা হচ্ছে)। কিন্তু তখন পর্যন্ত যেহেতু সাদ বিন আবি ওক্কাস এবং উতবা ফিরে আসেননি, অর্থাৎ যাদের উট হারিয়ে গিয়েছিল, তারা ফিরে আসেননি আর তাদের সাথে মিলিত হতে পারেন নি, তাই মহানবী (সা.) তাদের সম্পর্কে খুবই চিন্তিত ছিলেন যে, যদি তারা কুরাইশদের হাতে ধৃত হয় তাহলে কুরাইশরা তাদের হত্যা করবে। এ কারণে মহানবী (সা.) তাদের ফিরে আসা পর্যন্ত বন্দিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান। কাফেররা যখন বন্দীদের নিতে আসে তখন তিনি (সা.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুইজন ফিরে না আসে ততক্ষণ তোমাদের বন্দীদের ছাড়ব না। তাই তিনি (সা.) তাদের কথা মানতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমার লোকেরা নিরাপদে মদীনায় পৌছলে আমি তোমাদের লোকদের ছেড়ে দিব। অতএব যখন তারা উভয়ে পৌছে যান তখন তিনি (সা.) ফিদিয়া বা মুক্তিপণ নিয়ে উভয় বন্দিকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু মদীনায় অবস্থানকালে এই উভয় ব্যক্তির মাঝে একজনের ওপর মহানবী (সা.) এর নৈতিক চরিত্র এবং ইসলামী শিক্ষার সত্যতার এমন গভীর প্রভাব পড়েছিল যে, সে মুক্ত হয়েও ফিরে যেতে অস্বীকার করে আর মহানবী (সা.) এর হাতে বয়আত করে এবং মুসলমান হয়ে তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়,আর অবশেষে বি'রে মঊনার সময় শহীদ হয়। তার নাম ছিল হাকাম বিন কিসান।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন', পৃ: ৩৩০-৩৩৪) যদি অত্যাচার এবং জোরজবরদস্তি করে মুসলমান বানানো হতো তাহলে মানুষ এভাবে ইসলাম গ্রহণ করতো না।

হযরত আবু হুযায়ফা সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, বদরের যুদ্ধের দিন তিনি তার পিতার সাথে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন। তার পিতা মুসলমান ছিল না, কাফেরদের সাথে এসেছিল। তখন মহানবী (সা.) তাকে বাধা দেন এবং বলেন যে, তাকে ছেড়ে দাও, অন্য কেউ তাকে হত্যা করবে। অর্থাৎ অন্য কাউকে তার সাথে লড়াই করতে দাও। এরপর তার পিতা, চাচা, ভাই এবং ভাতিজাকে হত্যা করা হয়। তারা সবাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়। তিনি অর্থাৎ হযরত হুযায়ফা অত্যন্ত ধৈর্য প্রদর্শন করেন আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'লার সেই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যা তিনি মহানবী (সা.) এর সমর্থনে প্রদর্শন করেছিলেন, অর্থাৎ বিজয়।

(আব্দুল জাব্বার রচিত, তাসবীত দালায়েলুন নাবুয়ত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৮৫)

এই ঘটনা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত এটিও পাওয়া যায় আর ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মাঝ থেকে যার আব্বাসের সাথে যুদ্ধ হবে, সে যেন তাকে হত্যা না করে, কেননা তিনি বাধ্য হয়ে এসেছেন। তাই তাকে বন্দি করো, হত্যা করো না। যখন হযরত আবু হুযায়ফার কাছে এই কথা পৌঁছে বা কেউ তাকে অবহিত করে তখন মহানবী (সা.) এর সামনে নয় বরং কোথাও কোন সঙ্গীকে তিনি বলেন যে, আমরা কি নিজেদের পিতা, ভাই এবং আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দিব! এটি কেমন কথা। খোদার কসম, সে যদি আমার সামনে আসে তাহলে আমি অবশ্যই তার ওপর তরবারি চালাব। মহানবী (সা.) এর কাছে যখন এই কথা পৌঁছে তখন তিনি হযরত ওমরকে বলেন, ইয়া আবা হাফ্স! অর্থাৎ হে হাফ্সের পিতা, খোদার রসূলের চাচার চেহারায় তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে! হযরত ওমর বলেন, এই প্রথম মহানবী (সা.)আমাকে আবু হাফ্স ডাকনাম প্রদান করেন। হযরত ওমর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তরবারি দিয়ে তার গলা কেটে দিব, খোদার কসম, যে এই কথা বলেছে তার মাঝে কপটতা দেখা যায়। হযরত আবু হুযায়ফা বলতেন, মহানবী (সা.) নিষেধ করেন যে, না, এমনটি হবে না। কিন্তু হযরত আবু হুযায়ফা ভুল বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলতেন যে, আমি সেদিন যে কথা বলেছি, তার ক্ষতি থেকে আমি নিরাপদ নই। আমি অনেক বড় এমন কথা বলে ফেলেছি, যে কারণে আমি স্বস্তিতে থাকতে পারবো না, আমি সর্বদা এর জন্য ভীত থাকব, কিন্তু শাহাদতের মৃত্যু আমাকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ যদি আমি ইসলামের জন্য শহীদ হই তাহলেই আমি মনে করব যে, যে কথা আমি বলেছি তার অনিষ্ট থেকে আমি নিরাপদ। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।

(মুসতাদরিক আলাসসালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৭-২৪৮)

আবেগের আতিশয্যে একটি কথা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু এরপর ভীতিও জাগে আর সারা জীবন তার সেই ভীতি ছিল যতদিন না তিনি শাহাদত বরণ করেন।

হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) নিহত মুশরিকদের একটি গর্তে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। তাদের সেখানে নিক্ষেপ করা হলে মহানবী (সা.) তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে কূপবাসীরা! তোমারা কি তোমাদের সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছ যা তোমাদের মাবুদ অর্থাৎ প্রতিমা সমূহ তোমাদের সাথে করেছে। আমি তো নিশ্চিতভাবে সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছি যা আমার প্রভু আমার সাথে করেছেন। আর এখানে মাবুদ বলতে যদি আল্লাহ্ তা'লাকে বুঝানো হয় তাহলে এর অর্থ হলো তোমরা শাস্তি পাবে। যাহোক মহানবী (সা.) বলেন, আমি তো সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছি যা আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ আমি তাদেরকে শাস্তি দিব আর তারা তোমার ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। তখন মহানবী (সা.) এর সাহাবীরা নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আপনি কি তাদের সম্বোধন করছেন যারা মৃত! তিনি(সা.) বলেন, নিশ্চয় এরা জেনে গেছে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য ছিল।

মহানবী (সা.) এর নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয় তখন হযরত আবু হুযায়ফার চেহারায় অসন্তোষের ছাপ দেখা যায় কেননা তার পিতাকেও কুয়ায় নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। তিনি (সা.) তাকে বলেন যে, হে আবু হুযায়ফা! খোদার কসম, এমন মনে হচ্ছে যেন তোমার পিতার সাথে যে ব্যবহার হচ্ছে তা তোমার পছন্দ হচ্ছে না। মহানবী (সা.) হযরত আবু হুযায়ফাকে এই প্রশ্ন করেন। তখন হযরত আবু হুযায়ফা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার পিতা নম্র, সত্যবাদী এবং সঠিক মতামত প্রদানকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের মতে যা বুঝতেন সেটিকেই সঠিক মনে করতেন। কিন্তু তার মাঝে কোন অসৎ মনোভাব ছিল না। আর আমার বাসনা ছিল যেন আল্লাহ্ তা'লা তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে, এমনটি হওয়া এখন আর সম্ভব নয় আর তার সেই পরিণতি হয়েছে যা এখন হয়েছে, তখন এই বিষয়টি আমাকে ব্যাথিত করেছে। মহানবী (সা.) তখন হযরত আবু হুযায়ফার জন্য কল্যাণের দোয়া করেন।

(মুসতাদরিক আলাসসালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯)

হযরত আবু হুযায়ফা সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন। আর হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে ৫৩ বা ৫৪ বছর বয়সে তিনি শহীদ হন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এখন আমি আমাদের জামা'তের এক দীর্ঘদিনের সেবক ও বুযুর্গের স্মৃতিচারণ করব যিনি কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি হলেন প্রফেসর সঊদ আহমদ খান দেহলভী সাহেব। গত ২১ জানুয়ারী আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার পিতা মুহাম্মদ হাসান আহসান দেহলভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে তার দাদা পটিয়ালার শিক্ষক হযরত মাহমুদ হাসান খান সাহেবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের ৩১৩জন সাহাবীদের তালিকার ৩০১ নম্বরে তার নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পটিয়ালায় শিক্ষক ও চাকরিরত মৌলভী মাহমুদ হাসান খান সাহেব।

(পরিশিষ্ট আঞ্জামে আথম পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ১১, পৃ: ৩২৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের সিরাজে মুনীর পুস্তকে 'অতিথিশালা ও কূপ ইত্যাদির জন্য প্রাপ্ত চাঁদার তালিকা' শিরোনামের অধীনে তার নাম এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, পটিয়ালার মৌলভী মাহমুদ হাসান খান সাহেব।

(সীরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ:৮৫)

প্রফেসর সঊদ খান সাহেবের পিতা হযরত মুহাম্মদ হাসান আহসান দেহলভী সাহেব, যখন তার বয়স দশ-বারো বছর ছিল, তখন খুতবায়ে ইলহামিয়ার সময় কাদিয়ান গিয়ে এই মহান নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন।

(নয়ী জিন্দগী, প্রণেতা: মাসউদ হাসান খান দেহেলবী, পৃ: ২০৮)

প্রফেসর সঊদ খান সাহেব ১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে ওয়াকফ করেছিলেন। তিনি আলীগড় থেকে ফার্সিতে বিএ অনার্স করেছিলেন।

তার সাথে তার ভাইদের ওয়াকফের উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯৫৫ সনে একটি জুমুআর খুতবায় বলেন যে, আমি মনে করি মাস্টার মোহাম্মদ হাসান আহসান সাহেব এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা প্রশংসাযোগ্য। তিনি এক সাধারণ শিক্ষক ছিলেন এবং এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উপোস করে করে নিজ সন্তানকে লেখাপড়া করিয়েছেন এবং তাকে গ্র্যাজুয়েট করিয়েছেন। আর সাত ছেলের মাঝে চার ছেলেকে জামা'তের জন্য উৎসর্গ করেছেন। এখন তারা চার জনই ধর্মের সেবা করছে। আর তাদের প্রায় সবাই এমন নিষ্ঠার সাথে এই সেবা করছে যেমনটি ওয়াকফে জিন্দেগীর দায়িত্ব হয়ে থাকে। তিনি বলেন, যদি এই সন্তানরা ওয়াকফ না হতো তাহলে হয়তো তারা সাতজন মিলে দশ বা বিশ বছর যাবৎ নিজেদের পিতার নাম উজ্জ্বল রাখতো আর বলতো যে, আমাদের পিতা অনেক ভালো লোক ছিল, কিন্তু যখন আমার এই খুতবা ছাপা হবে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, যখন আমার এই খুতবা ছাপা হবে তখন লক্ষ লক্ষ আহমদী মোহাম্মদ হাসান আহসানের নাম নিয়ে তার প্রশংসা করবে আর বলবে যে, দেখ তিনি কেমন দৃঢ়চেতা আহমদী ছিলেন, দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নিজের সাত সন্তানকে উচ্চ-শিক্ষিত করেছেন আর এরপর তাদের চারজনকে জামা'তের কাছে দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ ওয়াকফ করে দিয়েছেন। আর তার সন্তানরাও এমন নেক যে, তারা সানন্দে নিজেদের পিতার এই কুরবানীকে মেনে নিয়েছে আর নিজেদের পক্ষ থেকেও পিতার এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে।

(নয়ী জিন্দগী, প্রণেতা: মাসউদ হাসান খান দেহেলবী, পৃ: ২০৮)

সঊদ খান সাহেব ১৯৪৬ সনের জুন থেকে নিয়ে ১৯৪৯ সনের অক্টোবর পর্যন্ত কাদিয়ানের তালীমুল ইসলাম হাইস্কুলে পাঠদান করেন। ১৯৪৯ সনের অক্টোবর থেকে কয়েক মাসের জন্য জামেয়া আহমদীয়ায় ইংরেজীর প্রফেসর হিসেবে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে ১৯৫০ সনে পশ্চিম আফ্রিকার ঘানায় ধর্মীয় সেবা করার জন্য প্রেরণ করেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড- ১৪, পৃ: ২৮৬)

তিনি ঘানার আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুল-এ প্রথম সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। এর জন্য ১৯৫০ সনের ৩০ এপ্রিল তিনি করাচী থেকে রওয়ানা হন এবং ৩০ জুন কুমাসি পৌছন। অর্থাৎ মে এবং জুন এই দুই মাস সফর করে সেখানে পৌছেন। আজ আমরা পাঁচ-ছয় ঘন্টায় সেখানে পৌছে যাই। পহেলা জুলাই থেকে তিনি কুমাসির আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুলে পাঠদান আরম্ভ করেন।

(নয়ী জিন্দগী, প্রণেতা: মাসউদ হাসান খান দেহেলবী, পৃ: ২৭৮)

তার এই সফরে কেন এত সময় লাগে- সে সম্পর্কে তার ভাতিজা ইরফান খান লিখেন যে, তিনি তার প্রথম কর্মস্থলে যোগ দেয়ার জন্য রাবওয়া থেকে ঘানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন আর তিন মাসে অত্যন্ত কষ্টদায়ক, এটি প্রায় দুই মাস হবে, সফর করে কুমাসি পৌছন। সে যুগে সামুদ্রিক জাহাজ পরিবর্তন করে করে পুরো সফর করতে হতো। উড়োজাহাজে নয় বরং সামুদ্রিক জাহাজে যেতে হতো। অতএব তিনিও করাচী থেকে 'আদান' এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি ১৬০ রুপিতে খাবার বিহীন টিকিট সংগ্রহ করেন আর 'আদান' থেকে ঘানার উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক জাহাজের পাশাপাশি বাস, ট্রাক এবং উড়োজাহাজে করে নাইজেরিয়া পর্যন্ত সফর করেন। নাইজেরিয়ার উড়োজাহাজের ৫৫ পাউন্ডের টিকিট ক্রয় করার জন্য তিনি নিজের ট্রাঙ্ক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করে দেন আর নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র একটি চাদরে বেঁধে নেন। এরপর নাইজেরিয়া মিশন হাউস থেকে তাকে ঘানা পর্যন্ত বাসের টিকিট দেওয়া হয়। নাইজেরিয়া পৌছানোর জন্য কিছুটা পথ উড়োজাহাজে সফর করেন, যা তিনি তার জিনিসপত্র বিক্রি করে ব্যবস্থা করেন। এরপর নাইজেরিয়া থেকে ঘানা পর্যন্ত সফর বাসে করেন। ১৯৫০ সনে পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা এবং হল্যান্ডএর জন্য আটজন আহমদী মুবাল্লেগ প্রেরণ সম্পর্কে আহমদীয়াতের ইতিহাসে তার নাম তালিকার শুরুতেই রয়েছে আর সেখানে ১ নম্বরে লেখা আছে যে, সঊদ আহমদ খান সাহেব, ঘানার উদ্দেশ্যে লাহোর থেকে যাত্রা করলেন ২৫ আমান ১৩২৯ হিজরী।

তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৮৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নির্দেশে ১৯৫৮ সনে তিনি পাকিস্তানে আসেন আর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. করেন। এরই মাঝে তার পিতা মোহতরম হাসান আহসান দেহলভী সাহেব ১৯৫৫ সনের আগস্ট মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি ঘানা থাকতেই তার পিতা ইন্তেকাল করেন। ১৯৬১ সনে পুনরায় ঘানায় তার পদায়ন হয়, যেখানে তিনি আবারও পূর্ণ উদ্যমে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত ধর্মীয় সেবা অব্যাহত রাখেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর অনুমোদনক্রমে হুযূরের ইউরোপ সফরের সময় রাবওয়ার মসজিদ মুবারক-এ মাগরিবের নামাযের পর 'মজলিসে তলকীনে আমল' গঠিত হয়, যার ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রত্যহ ১৫ মিনিটের একটি তরবিয়তী বক্তৃতা হতো। ৭ জুলাই তারিখ থেকে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা শোনা হতো। এটি এক জ্ঞানগর্ভ সভা ছিল। এই মসলিসে যেসব বুযুর্গদের বক্তৃতা হয় তাদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-২৪, পৃ: ৩৯২-৩৯৩)

সালানা জলসার সময় বক্তৃতা সমূহের অনুবাদের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর বক্তৃতা সমূহের ইংরেজী অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাবওয়ার শেষ জলসা পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। প্রফেসর সঊদ খান দেহলভী সাহেবের ছাত্রদের মাঝে ঘানার মোকাররম আব্দুল ওহাব আদম সাহেব এবং বি. কে. আড়ু সাহেবও ছিলেন, যিনি এখানে বসবাস করেছেন। ১৯৬৮ সনে পাকিস্তানে ফিরে আসার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) মোকাররম প্রফেসর সঊদ আহমদ খান দেহলভী সাহেবকে তালীমুল ইসলাম কলেজে ১৯৬৯ সনে পাঠদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) প্রফেসর সঊদ খান সাহেবকে জামেয়া আহমদীয়ায় এক বছরের জন্য ইংরেজীর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। জামেয়া আহমদীয়ায় নিযুক্ত হওয়ার সময়ও তিনি তালীমুল ইসলাম কলেজে প্রফেসর হিসেবে পাঠদানের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সনের ২ মার্চ তারিখে জামেয়া আহমদীয়ায় দায়িত্ব পালন আরম্ভ করেন। আর এক বছর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন।

প্রফেসর সঊদ খান দেহলভী সাহেব সম্পর্কে তার বড় ভাই মাসুদ খান দেহলভী সাহেব, যিনি আলফযলের সম্পাদকও ছিলেন, কয়েক বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন, বলতেন যে, আমাদের ভাই সঊদ আহমদ একটি ভ্রাম্যমান পাঠাগার। বহু বিষয় তার জানা ছিল। জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

তার কন্যা রাশেদা সাহেবা লিখেন, আমার পিতা অত্যন্ত নম্র, পরম বিনয়ী আর জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। খুবই ইবাদতগুযার ও তাহাজ্জুদগুযার বুযুর্গ ছিলেন। খুবই অতিথিপরায়ণ এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন। আর যা কিছু তিনি লিখেছেন তার সবই বাস্তব, তিনি এমনই ছিলেন। তার ভাতিজা নাফিস আহমদ আতিক জামা'তের মুরব্বী। তিনি লিখেন যে, মরহুম অত্যন্ত বিনয়ী, মুত্তাকী, আল্লাহর ওপর নির্ভরকারী একজন নেক এবং সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। তার নিষ্ঠা এবং ধর্মসেবার প্রেরণা সকল ওয়াকফে যিন্দেগীর জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। এই মুরব্বী সাহেব আরো লিখেন যে, একবার তিনি খাকসারকে বলেন, পোশাক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাকে প্রয়োজন হলেই ব্যবহার করা উচিত। ফ্যাশন, কৃত্রিমতা এবং বিলাসিতা একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর শোভা পায় না। তার জীবনে লজ্জাশীলতার দিকটিও উল্লেখযোগ্য ছিল।

আল্লাহর বাণী

"নিশ্চয় মোমেনগণ পরস্পর ভাইভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর। (হুজরাত: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

ইমামের বাণী

"একমাত্র পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে স্বীয় প্রভুর রহমত হইতে হতাশ হইতে পারে?"

(সূরা হিজর: আয়াত: ৫৭)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

সঊদ খান সাহেবের একজন ঘানিয়ান ছাত্র আই. কে. গিয়াসি সাহেব লিখেন, সঊদ সাহেব ১৯৫০ থেকে ৫৫ পর্যন্ত কুমাসির তালীমুল ইসলাম সেকেন্ডারী স্কুলের প্রাথমিক সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রিন্সিপাল ছিলেন আর ডাক্তার এস. পি. আহমদ সাহেব এর প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সঊদ সাহেব ইংরেজী সাহিত্য, ইংরেজী ইতিহাস এবং ইউরোপের ইতিহাসের অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং উৎকৃষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি তাকে পড়াতেন। তিনি অর্থাৎ এই ঘানিয়ান বন্ধু আরো লিখেন যে, তার ইংরেজী গ্রামারের যতটা সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষত বাক্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার মতো আমি আর কাউকে দেখি নি। তিনি বলেন, আমার ভাষাজ্ঞানকে উন্নত করার ক্ষেত্রে তার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।

রাবওয়ার জামেয়া আহমদীয়ার সিনিয়র সেকশনের প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব লিখেন যে, প্রফেসর সঊদ খান সাহেব অত্যন্ত বিনয়ী, বুযুর্গ এবং জামাতের জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যখন জামেয়ায় পাঠদান করতেন তখন আমরাও ছাত্র ছিলাম। জামেয়ার শেষ বর্ষ পর্যন্ত সবসময় সময়মতো ক্লাসে আসতেন আর পিরিয়ড শেষ হওয়ার শেষ মিনিট পর্যন্ত পড়াতেন। ছাত্ররা কোন সময় এদিক সেদিকের কোন কথায় তাকে রত করার চেষ্টা করতো, যেন পড়া না হয় কিন্তু তিনি কঠোরতা ও বকাঝকার পরিবর্তে খুবই সুন্দরভাবে এটিকে এড়িয়ে যেতেন এবং পড়ানো অব্যাহত রাখতেন। তিনি বলেন, আমি একটি কথা নোট করেছি যে, তার হৃদয়ে ওয়াকফে জিন্দেগী ছাত্রদের প্রতি অনেক সম্মান ছিল, আর ক্লাসে কাউকে কোন কারণে যদি কঠোরভাবে সতর্ক করতে হতো তাহলে তার আত্মসম্মান ও মর্যাদার প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। তিনি আরো লিখেন, এম.টি.এ.-এর প্রারম্ভিক যুগে যখন বিভিন্ন প্রোগ্রাম রেকর্ড করা হয় তখন তিনি অর্থাৎ সঊদ খান সাহেব সীরাতুন্নবীর প্রোগ্রাম রেকর্ড করান। তিনি বার্ধক্যে ছিলেন, কিন্তু পুরো প্রোগ্রাম অত্যন্ত পরিশ্রম করে নিজে প্রস্তুত করতেন আর আমাদের মাঝে প্রশ্ন বণ্টন করে দিতেন। সবগুলো প্রশ্ন নিজের হাতে লিখে দিতেন। কখনো কখনো পরিবেশ কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে যেতো, প্রোগ্রাম করার সময় তর্ক আরম্ভ হতো যে, এটিকে এভাবে নয় বরং সেভাবে করতে হবে, কিন্তু তিনি এত নম্র এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন যে, তার কপালে কোন ভাঁজ দেখা দিত না। এমন মনে হতো যেন কেউ কোন কটুকথা বললে সেটি তার কানে প্রবেশই করে নি, আর মুচকি হাসি দিয়ে একান্ত সহজভাবে যেখানে প্রোগ্রাম বাধাগ্রস্ত হতো সেখান থেকেই পুনরায় রেকর্ডিং আরম্ভ করাতেন।

প্রফেসর সঊদ খান সাহেবের ইন্তেকালের পর তার পাশে বসবাসকারী প্রতিবেশী ফযল ইলাহী মালেক সাহেব নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলেন, এমন প্রতিবেশী সবার লাভ হয় না। খুবই সাদাসিধে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি এক পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র সাদ সঊদ সাহেব যুক্তরাজ্যে একটি জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে বাস্তবে, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, তার গুণাবলী তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। খিলাফতের সাথে পরম ভালোবাসা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল আর অসাধারণ মান ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তান এবং বংশপ্রজন্মকেও খিলাফত এবং জামা'তের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত রাখুন এবং তার মর্যাদা অনবরত উন্নীত করুন। নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

৯এর পাতার পর..

এই বক্তৃতার সাথেই দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় অধিবেশন

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান সঞ্চালিত হয় মাননীয় মুনীর আহমদ হাফযাবাদী সাহেবের সভাপতিত্বে। তিলাওয়াত ও নযমের পর অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় তানবীর আহমদ খাদিম সাহেব, নায়েব নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল -' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে।' তিনি পাঞ্জাবি ভাষায় নিজের বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই বক্তব্যের পর কিছু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নিজেদের অভিমত তুলে ধরেন।

১) সন্ত বাবা সুখদেব সিং বেদি সাহেব।

তিনি গুরু নানক দেবের ষোলতম পুরুষ আর বর্তমানে তিনি ডেরা বাবা নানকে বসবাস করেন। তিনি সর্ব প্রথমস সমস্ত সম্মানীয় ব্যক্তি ও জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ ও সালাম জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন- আজ আমি এখানে এসে বড়ই আনন্দিত। আপনাদের সকলকে জলসার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এখানে সমস্ত ধর্মের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত আছেন। ভালবাসার প্রসারে আপনাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আপনাদের এই জলসায় এসে আন্তরিক প্রশান্তি অনুভব করি। আপনাদের এই ভ্রাতৃত্ববোধকে আল্লাহ্ তা'লা নিরন্তর উন্নতি দিন। পৃথিবী আজ অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। আমাদের সকলকে মিলে ভালবাসার এই বাণী আগে পৌঁছে দেওয়া উচিত। আমি যখনই পৃথিবীর কোন প্রান্তে যাই, সেখানকার জামাতের সদস্যরা ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে আলাপ করে এবং অনেক সম্মান দেয়। আমি সব শেষে আরও একবার সকলকে এই মহান জলসার অভিনন্দন জানাব।

২) ফতেহ সিং বাজওয়া। (বিধায়ক, কাদিয়ান)

তিনি সমস্ত উপস্থিতবর্গের উদ্দেশ্যে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে একটি পঙক্তি পাঠ করে, যার অর্থ হল- এই শহর হল ভক্তি ও ভালবাসার, যার মাটি আমার চোখের শোভা হয়ে আছে।

তিনি বলেন, কাদিয়ান শহর এক পবিত্রভূমি। যে বাণী এই শহর থেকে উত্থিত হয়েছে, তা আজ ২১২ টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বে যেখানেই জামাতের সদস্যরা রয়েছেন, তাদের সঙ্গে আলাপ হলে এক অকৃত্রিম ভালবাসা ও আন্তরিকতার সুবাস পাওয়া যায়। আমাদের পরিবারের যখনই কেউ বিদেশে যায়, তারা আপনাদের কাছ থেকে অনেক ভালবাসা পায়। এটি এই পবিত্র ভূমির ভালবাসার শিক্ষারই পরিণাম। আপনারা সৌভাগ্যবান যে এই জামাতের সদস্য যা বিশ্বব্যাপী ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করছে। আপনাদের জামাতের বাণীর ভিত্তি হল ভালবাসা। জামাত সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল, সকলের সঙ্গ দেয়, অভাবপীড়িতদের সাহায্য করে। আমিও এই জামাতকে নিজের পরিবারের অঙ্গ হিসেবে মনে করি। আমাদের সম্মানীয় পূর্বপুরুষদেরও জামাতের সঙ্গে নিবিড় ভালসাসার সম্পর্ক ছিল। আমি আপনাদের সকলকে এই মহান জলসার অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই।

৩) ফাদার সামান্ত রায়, (বিশপ উত্তর ভারত, অমৃতসর)

তিনি সর্বপ্রথম সমস্ত সম্মানীয় অতিথিদেরকে সালাম ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন- এটি আমার পরম সৌভাগ্য যে, গত কয়েকবছর যাবত আমি এই মহান জলসায় অংশ গ্রহণ করতে পারছি। আপনাদের জামাতের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবী আজ ভালবাসার সন্ধানে। যে বিষয়টি আমাদের সব থেকে বেশি প্রয়োজন, সেটি হল ভালবাসা। আমাদের সকলকে নিজেদের মধ্যেকার ঘৃণা ও বিদ্বেষে বিষ বের করে পুণ্যের দিকে, একতা ও ভালবাসার দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের একত্রে মিলে কাজ করতে হবে। জলসার এই মঞ্চ যা আমার ব্যবহার করছি, এটি এই কাজের জন্য খুব ভাল সুযোগ। আমি আপনাদেরকে জলসার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। যে দৃষ্টান্ত জামাত স্থাপন করছে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও তা অবলম্বন করা উচিত এবং ভালবাসার বাণী প্রসার করা উচিত। আমাদের সকলে মিলে এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৪) বলবিন্দর সিং লাডি সাহেব (বিধায়ক, হরগোবিন্দপুর) তিনি বলেন, আজকে আনন্দের দিন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও জামাত আহমদীয়া তাদের মহান জলসার আয়োজন করছে। দূর-দূরান্ত থেকে যে সমস্ত মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমি তাদের সকলকে স্বাগত জানাই। জামাত আহমদীয়া মানব সেবার যে মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলেছে তা প্রশংসনীয়। জামাত প্রত্যেক পুণ্য কর্মে সকলের থেকে এগিয়ে। আমি আরও একবার সকলকে জলসার অভিনন্দন জানাই।

(ক্রমশঃ........)

আল্লাহ্‌র বাণী

এবং আত্মীয়কে তাহার প্রাপ্য দাও; এইরূপ মিসকীন ও পথচারীগণকেও; এবং (তোমাদের ধন-সম্পদ) কোন প্রকার অপব্যয় করিও না। (বানী ইসরাইল: ২৭)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

আল্লাহ্‌র বাণী

' হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে উদাসীন না করে। এবং যাহারা এইরূপ করিবে-তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

(মুনাফেকুন: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

১২৪তম কাদিয়ান সালানা জলসার রিপোর্ট।

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসার মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না। তাঁর প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের প্রেমে বিলীনতার প্রমাণ। এই শেষদিনগুলিকেও দরুদে পরিপূর্ণ করে দিন এবং নতুন বছরকেও দরুদ ও সালাম দিয়ে স্বাগত জানান, যাতে আমরা অতিশীঘ্র সেই সমস্ত কল্যাণরাজি অর্জনকারী হই যা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টার ন্যাশনাল-এর মাধ্যমে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ।

আমি এই জনপদ অর্থাৎ কাদিয়ানে খোদা তা'লাকে দেখেছি। আমি ইসলামের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় পূর্ণ হতে দেখেছি। পৃথিবীতে মাহদীর দাবিদার অনেক রয়েছে। তারা নিজেদের তবলীগ প্রসারের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ব্যতিরেকে কারো একটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নি। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি বেহিশতি মাকবারায় সমাহিত আছেন যাঁর ফলকে লেখা খোদিত আছে- 'মাযার মুবারক হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদী (আ.)। আমি আহমদীয়াতে বই পুস্তক অধ্যয়ন করেছি আর আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। আহমদীরা অন্যান্য মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী এবং উৎকৃষ্ট মুসলমান। আমি জানি না আরও কত শতাব্দী অতিক্রান্ত হবে, যেদিন সমগ্র বিশ্বের সব থেকে উচ্চ নারা ধ্বনি কাদিয়ান থেকে উত্থিত হবে। ইনশাআল্লাহ্॥

কাদিয়ানের জলসা সালনায় অংশগ্রহণকারী নওমোবাঈনদের ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া।

জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে যে প্রেমের বাণী প্রসার করছে তা প্রশংসনীয়। আমি হুযুর আনোয়ারকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যিনি সারা বিশ্বে প্রেমের বাণী প্রসার করছেন। আপনাদের জামাতের খলীফা সারা বিশ্বে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করছেন এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

মুসলিম সমাজ চিরকাল শিখধর্মের অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকেছে, তারা প্রত্যেক বিপদের সময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই দুটি ধর্মের বিশেষত্ব হল এরা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করে।

পৃথিবীতে খুব কম জলসা এমন হয়ে থাকে যেখানে মানবতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। মানবতার সেবা সর্বাপেক্ষা মহান কাজ যা আপনার জামাত করছে। আজ যে উৎকৃষ্ট পন্থায় শান্তি ও ভালবাসার বাণী জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে তা প্রশংসনীয়।

জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের মতামত।

৪৮ টি দেশ থেকে ১৮,৮৬৪ জন অতিথির জলসায় অংশগ্রহণ। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণে লন্ডনে ৫, ৩৪৫ জন ব্যক্তি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

****তাহাজ্জুদের নামায* কুরআনের দরস ও যিকরে ইলাহিতে পরিপূর্ণ পরিবেশ* উলেমাগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য* সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া* দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় জলসার অনুষ্ঠানাদির সরাসারি অনুবাদ সম্প্রচার। * জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তি তথ্যচিত্র এবং বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনীর আয়োজন। * নিকাহসমূহের ঘোষণা* প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রচার।***

রিপোর্ট : মনসুর আহমদ মসরুর

দ্বিতীয় দিন (দ্বিতীয় অধিবেশন) (৪র্থ পর্ব)

সর্ব প্রথম সেনাপতি যায়েদ শহীদ হয়েছে। এরপর সেনাদলের পতাকা হাতে নেন হযরত জাফর বিন আবি তালিব। তিনিও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আমি তাঁকে নিজের চোখে খোদার পথে জীবন উৎসর্গ করতে দেখেছি। এরপর তৃতীয় আমীর আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহাও শহীদ হন। হুযুর (সা.) এই সেনাপতিদের জন্য মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের শুভ পরিণতির সংবাদ দিয়ে বলেন, আমাকে জাফর, যায়েদ এবং আব্দুল্লাহ্‌র এই দৃশ্য দেখানো হয়েছে যে, তারা মুক্তো খচিত এক তাবুতে অর্থাৎ একটি অপূর্ব সুন্দর শিশ মহলে অবস্থান করছেন আর তারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক সিংহাসনে আসীন রয়েছেন।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৯)

অতঃপর শহীদদের বিধবা স্ত্রীদের স্বান্তনা দান করে তিনি (সা.) বলেন- এই বাচ্চাদের অভাব ও অনাহার যাপনের চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিবে না। আমি কেবল ইহজগতেই এদের অভিভাবক নই, বরং পরকালেও তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করব। (মসনদ আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৪)

হযররত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.)-এর জীবনী সম্পর্কে তিনি বলেন- তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শ্বশুর, হযরত সৈয়্যাদা নুসরাত জাহাঁ বেগম উম্মুল মোমিনীনের পিতা, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর নানা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মীর সাহেব ছিলেন খোয়াজা মীর দরদ (রহ.)-এর বংশধর, যিনি সপ্তদশ শতাব্দী খৃষ্টাব্দে দিল্লীর প্রসিদ্ধ সুফি ও উর্দু কবি ছিলেন এবং যাঁর পিতা খোয়াজা মহম্মদ নাসের (রহ.) তৎকালীন যুগে মুজাদ্দিদ ছিলেন। ১৮৯৪ সনে মার্দান থেকে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কাদিয়ান আসেন। পেনশন মঞ্জুর হওয়ার পর কাদিয়ানেই থেকেই যান এবং নিজের যাবতীয় শক্তিবৃত্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চরণে নিবেদন করেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে আজীবন জামাতের সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গিত করেছিলেন। তিনি হুযুর (আ.) জমিজমার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও খাজনা আদায়ের মুনশী এবং নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের জন্য প্রকৌশলীর দায়িত্বও তিনিই পালন করেছেন। তিনি বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। হুযুরের সফরের সময়ও তিনিই বাড়িঘরের রক্ষাণাবেক্ষণ করতেন। হুযুরের শেষ জীবনের সফরগুলিতে তিনি সঙ্গে থেকে তাঁর সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। মোট কথা মীর সাহেব কাদিয়ান এসে হুযুর (আ.)-এর যাবতীয় পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়াদির ব্যক্তিগত সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর উপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর এমন পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বলতেন- ' মীর সাহেবের কাজে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।'

এরপর ৮ এর পাতায়...

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.)- এর নির্দেশনাবলীর আলোকে
লাজনা ইমাউল্লাহ্গণের তরবিয়ত সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী

মূল : বুশরা পাশা সাহেবা (সদর লাজনা ইমাউল্লাহ ভারত)
অনুবাদ : জহিরুল হাসান সাহেব (ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান)

(শেষভাগ)

হুজুর বলেন যে,

ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না বরং পর্দার মধ্য থেকে যদি কাজ করার প্রয়োজন পড়ে তবে তা পুরো করা যেতে পারে।

হুজুর বলেন,

"একটা বয়সের পর মেয়েরা তাদের ক্লাস ফেলো এবং স্কুল ফেলো ছেলেদের থেকেও পর্দা করবে। প্রয়োজন পড়লে পর্দার মধ্যে থেকেই কথা বলা উচিত। মেয়েরা নিজেরাও যেন বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখে, আর পিতা-মাতা বিশেষ করে মায়েরা যেন বিষয়টির উপর নজর রাখে যে, একটা বয়সের পর মেয়েরা যদি অন্য কারোর বাড়িতে যায় সেক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্কের কাউকে যেন সঙ্গে নিয়ে যায়। আর যে বান্ধবীর বাড়িতে কোন সময় তার ভাই যদি থেকে থাকে তাহলে বিশেষ করে সেই সময়গুলিতে সেই বাড়িতে যেন না যাওয়া হয়।"

(জলসা সালানা জার্মানি ১১ই জুন ২০০৬)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইঃ) বলেন :

"অনেক মেয়েরা বলে যে, আমরা মাথা ঢেকে নিয়েছি এটাই যথেষ্ট। অথচ মাথা সেভাবে আবৃত থাকে না যেভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ) নির্দেশ প্রদান করেছেন। চুল পরিষ্কার দৃশ্যমান হতে থাকে। অর্ধেক মাথা আবৃত থাকে আর অর্ধেক অনাবৃত। ঘাড় অবধি দেখা যায়। যদি কোট পরে তবে কনুই অবধি খোলা থাকে। হাঁটুর উপর অবধি কোট থাকে। এসব না তো একজন আহমদী মেয়ের শালিনতার পরিচায়ক আর না একজন আহমদী মহিলার স্বাধীনতার পরিসীমা।

বরং এরকম স্বভাবের দ্বারা সে নিজের শালিনতার উপর অভিযোগ আরোপ করে থাকে আর আহ্মদী হিসাবে নিজের স্বাধীনতার গণ্ডীকে উলঙ্ঘনকারী হতে থাকে।"

(জলসা সালানা জার্মানি, ২৩ আগষ্ট ২০০৮)

তিনি আরও বলেন,

"যাইহোক যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি য়ে, যৌবনে পদার্পণ করলে তাদের কোট হাঁটুর নীচে অবধি হওয়া চাই। যা তাদেরকে পুরো শরীর আবৃত করবে, ফ্যাশন নয়। আর হাতা লম্বা হওয়া চাই। একজন আহমদী মহিলা ও একজন আহমদী যুবতীর এটি পরিচয় হওয়া উচিত যে, তার পেশাক-আশাক যেন শালীন হয়। তাই নিজেদের পোশাকের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন। কেননা এটাও একজন আহমদী মহিলার পবিত্রতার জন্য খুবই জরুরী। এটা খুবই দুঃখজনক হবে যদি নবাগতরা এই বিষয়টির মর্মার্থ অনুধাবন করে নিজেদের পোশাককে শালীনতা বজায় রাখা শুরু করে আর প্রবীন আহমদীরা সমাজের কুপ্রভাবের কারণে নিজেদের মার্জিত পোশাকের প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। সুতরাং এসব কথার প্রতি খেয়াল রাখবেন আর আত্ম-বিশ্লেষণ করবেন। নয়ত শয়তানের আক্রমণ যেমনটা আমি বললাম মিডিয়ার মাধ্যমে এমন প্রবল ভাবে হয়ে চলেছে যে, এর থেকে পরিত্রাণ দূরূহ।

(জলসা সালানা জার্মানি ২৩ আগষ্ট ২০০৮)

"যুবতী মেয়েদের বলুন যে, তারা আল্লাহতা'লার নিকট পুণ্যবতী, ধার্মিকা, মো'মেনা হিসাবে তখনই পরিগণিত হবে যখন তারা নিজেদের সম্মান ও সতীত্বকে উত্তম উপায়ে সুরক্ষিত রখাবে। আর সেসমস্ত বিধি-নিষেধের উপর আমল করবে যেগুলি করার নির্দশে দেওয়া হয়েছে। আর সে সমস্ত কথা থেকে বিরত থাকবে যেগুলো নিষেধ করা হয়েছে। এবং তাকওয়া অবলম্বন করবে।"

(জলসা সালানা জার্মানি ২০১১)

পুনরায় হুজুর বলেন,

"পিতা-মাতাকে সন্তানদের ধর্মের সঙ্গে জোড়ার এবং তাদের লজ্জার সুরক্ষার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হবে। এবং জন্য নিজেদের নমুনা তুলে ধরতে হবে।"

(খুতবা জুমআ ১৩ জানুয়ারী ২০১৭)

হুজুর আরও বলেন, যখন আপনারা সংগ্রামী ভাবে নিজেদের পরিবেশের মধ্যে এমন পুণ্য কাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন তখন আপনাদের হৃদয়ও এতে প্রশান্তি লাভ করবে। আজকাল সমাজে অশ্লীলতা এবং নারী-পুরুষের মেলামেশা অবাধ হয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহমদী মহিলারা যদি পুণ্যবতী হয়ে অন্যদের একথা বলে বেড়ায় যে, নারীর সম্মান তার পুণ্যবতী হওয়ার মধ্যেই নিহিত তবে এমন দৃষ্টান্ত পুণ্যকর্ম প্রসারের কারণ হবে।"

(জলসা সালানা তানযানিয়া ২০০৫)

তারপর সোশ্যাল মিডিয়ার দরুন আজকাল বিভন্ন প্রকারের নোংরামীর জন্ম হচ্ছে। ধর্মকে জাগতিকতার উপর অগ্রগণ্য রাখার দৃঢ় সংকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার পাশাপাশি নিজেদেরকেও শয়তানের আমন্ত্রণ থেকে বাঁচতে হবে আর নিজের সন্তানদেরকেও এর থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

হুজুর বলেন,

কোরআন করীম বিভিন্ন প্রকার অবিষ্কারাদীরও ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ইন্টারনেটও অন্তর্গত। আর টেলিফোনের যে ব্যবস্থাপনা তন্মধ্যে এটিও একটি।..

কিন্তু যদি আবিষ্কারাদীকে অপপ্রয়োগ করতে থাকেন তখন তা অর্থহীন বিষয়ের রূপ নেবে। আর এ রকম বেকার বষিয়বস্তু থেকে সুরক্ষিত থাকার আদেশ দিয়েছেন। যেমনটা বলেছেন যে, মো'মিনের পরিচয় হল এটাই । যারা অর্থহীন বিষয়াদিকে পরিত্যাগ করে। অর্থহীন বিষয়বস্ত থেকে মুক্ত থাকে। যখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে বান্ধবীদের সাথে Chat করে আর এক অপরের সঙ্গে হাসি-বিদ্রুপ করে ....অথবা লোকেদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরানোর কাজে এগুলি ব্যবহার করবেন। অপর কোন মহিলার জীবন তার স্বামীর সঙ্গে ইন্টারনেটের মারফৎ নষ্ট করবেন। একে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করতে থাকবেন, সেক্ষেত্রে এসব কিছু বেকার বিষয়বস্তর অন্তর্গত হবে। আর গুনাহ্গারও হতে থাকবেন। তারপর আজকাল মোবাইলে Text বার্তালাপ দওয়া হয়ে থাকে। এটাও নতুন একটা প্রচলন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করার আর অপরিচিতদের সঙ্গে কথা বলার একটা খুব সোজা পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। খুব সহজ ভাবেই বলা হয়ে থাকে যে, Text Massege -ই তো ছিল কোন কথা তো হয় নি। একে অপরের সম্পর্ক বাড়ে এমন যে, বান্ধবী নিজের ফোন বন্ধুদের মধ্যে কাউকে দিয়ে দিল অথবা নিজের বান্ধবীকেই ফোন দিয়ে দিল। মোবাইল নম্বর দিল অথবা অন্য ফোন মাধ্যমে একে অপরের নম্বর জেনে নিল। তখন Text Massege এর ধারা শুরু হয়ে যায়। আবার ১২, ১৩, ১৪ বছরের ছেলে-মেয়েরাও টেলিফোন নিয়ে ঘুরছে। একে অপরকে Massege প্রেরণ করছে। আর এই বিষয়টি হল বিপদগামী হওয়ার বয়স। শেষ পর্যন্ত পরিণতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, যা বেকার বিষয়বস্তু ছিল তা গুনাহর রূপ ধারণ করে। সেজন্য আহমদী মেয়েরা নিজেদের সতীত্বের জন্য নিজেদের সম্মানের জন্য নিজেদের পরিবারের সম্মানের জন্য জামাতের পবিত্রতাকে লক্ষ্য রেখে যার সাথে তারা সংশ্লিষ্ট ও সংবদ্ধ এসব জিনিষ থেকে বিরত থাকুন।

(সালানা ইজতেমা লাজনা ইমাউল্লাহ্ জার্মানি ১১ই জুন ২০০৬)

হুজুর বলেন :

".....এ জন্য ইন্টারনেট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই দরকার। এসব ছাড়াও মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করে তোলার জন্য ইন্টারনেটে বহু প্রোগ্রাম রয়েছে। টিভিতেও অশ্লীলতার বহু প্রমাণ বিদ্যমান। পিতা-মাতার এসব চ্যানেলগুলি ব্লক করে রাখা উচিত। ...যদি নোংরা প্রোগ্রাম দেখা হচ্ছে তবে বাবা-মায়েদেরও দায়িত্ব আর ১২-১৩ বছরের যে সমস্ত মেয়েরা তাদেরও এটি বোঝার বয়স, তাদেরও এটি দায়িত্ব যে, এসব থেকে যেন বিরত থাকে। আপনারা আহমদী, আর আহমদীর চরিত্রও এমন হওয়া উচিত। যা অভিনব এবং তুলনাহীন হবে। যেন জানা যায় যে, এ একজন আহ্মদী মেয়ে।"

(ভাষণ সালানা ইজতেমা লাজনা ইমাউল্লাহ্ জার্মানি ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১১)

মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুজুর বলেন :

"এসব কথাগুলির উপর দৃষ্টি রাখা এবং এগুলিকে সীমাবদ্ধ করা দরকার। তাই ওদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যম সম্পর্কে আপনাদের চিন্তা করা উচিত। বাড়ির কাজে তাদেরকেও ব্যস্ত রাখুন। জামাতীয় কর্মকাণ্ডে তাদেরকে শামিল করুন এবং এমন ব্যস্ততায় রাখুন যা তাদের জন্য এবং সমাজের জন্য কল্যাণের কারণ হয়। এটি খুব বড় একটি দায়িত্ব যা আহমদী মায়েদের

সম্পাদন করা উচিত।

(পয়গাম সালানা ইজতেমা জার্মানি ১০ জুলাই ২০১৬)

তিনি আরও বলেন :

"অনেক পিতা-মাতা আবার বেশি লেখাপড়া জানা হয় না। জামাতীয় ব্যবস্থাপনার উচিত এসব সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করা। একই রকমভাবে লাজনা ইমাউল্লাহ, আনসারুল্লাহ, খুদ্দামুল আহমদীয়া এসব সংগঠনগুলিও নিজ নিজ গণ্ডীতে সমাজের এসব নোংরামী থেকে বিরত থাকার উপায় অন্বেষণ করুন। যুবক ছেলে ও মেয়েকে জামাতীয় ব্যবস্থাপনা অথবা অঙ্গ সংগঠনগুলির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত।"

(আয়লি জিন্দেগী কি মাসায়েল আউর উনকা হাল)

নারীর একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব স্ত্রী রূপেও বিদ্যমান। স্ত্রীর উপর স্বামীর অনুগত থাকা একান্ত আবশ্যক। স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের নিগরান হয়ে থাকে। আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, "যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছে, রমজানের রোজা পালন করেছে এবং নিজেকে নোংরা কাজ থেকে বিরত রেখেছে আর আপন স্বামীর আনুগত্য করেছে এবং তার কথা শুনে চলেছে এরপর নারী তার ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।"

(আয়লি জিন্দেগী কি মাসায়েল আউর উনকা হাল)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মহিলাদের উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন :

"তাকওয়া অবলম্বন করো। পার্থিব জগতের সৌন্দর্যরাশীর প্রতি বেশি মন দিও না। জাতপাত নিয়ে ঈর্ষা করো না। কোন মহিলাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না। স্বামীদের কাছে তাদের ক্ষমতার বাইরে কিছু প্রত্যাশা করো না। পুণ্যবতী ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে কবরে যাওয়ার চেষ্টা করো। খোদাতা'লা কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যকীয় কর্তব্য নামাজ, যাকাত ইত্যাদিতে অবহেলা প্রদর্শন করো না। মনের অন্তঃকরণ থেকে আপন স্বামীর প্রতি অনুগত থেকো। তাদের আত্ম মর্যাদার একটা বড় অংশ তোমাদের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তোমরা এ হেন দায়িত্বাবলী এমন উত্তমরূপে পালন করো যে, খোদাতা'লার নিকট পুণ্যবতী ও অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হও। গর্ব না করো আর স্বামীর ধন-সসম্পদকে বৃথা খরচ না করো।"

(কিশতিয়ে নূহ্ পৃষ্ঠা : ৭২)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইঃ) বলেন :

"আমাদের ধর্ম স্ত্রীকে বাড়ির নেগরান ও স্বামীকে রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্‌তা'লাকে শনাক্ত করবে আর নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সচেতন হবে ততক্ষণ তোমাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে না।"

(জলসা সালানা ইউ. কে লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ২৯ জুলাই ২০০৬)

"আবার ধন্যবাদ জানানোর অভ্যাস । আল্লাহতা'লা বলেছেন :

তোমরা আল্লাহর প্রাতি কৃতজ্ঞ থেকো। সে আরও দান করবে। তোমাদের উপর তার নিয়ামতরাজি বাড়াতেই থাকবে। তাই সাংসারিক জীবনেও এমন কৃতজ্ঞ থেকো। আপন স্বামীদের আয় লক্ষ্য করুন। তার মধ্যেই ব্যয় করে জীবন ধারণ করুন। সংসার যাপন করুন। আর এসবের শুকরিয় জ্ঞাপন করুন। .... আপন আপন সীমার মধ্যে থেকেই জীবন যাপন করুন, তখনই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব।"

(জলসা সালানা ইউ. কে লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১)

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) সালানা ইজতেমা বরতানিয়া উপলক্ষ্যে মহিলাদের উদ্দেশ্যে উম্মুল মো'মিনিন হযরত আম্মাজান (রাঃ)-র উপদেশাবলী উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

"এখন আমি উম্মুল মো'মিনিন হযরত আম্মাজান (রাঃ)-র কিছু উপদেশ আপনাদের সামনে রাখবো। যা তিনি তাঁর এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জেষ্ঠ্যা কন্যা হযরত নবাব মোবারকা বেগম সাহেবা (রাঃ)-র বিদায়ের সময় তাকে করেছিলেন, সেগুলির মধ্য হতে কিছু আপনাদের সামনে রাখছি। তিনি (রাঃ) বলেন :

"স্বামীকে লুকিয়ে অথবা এমন কাজ যা স্বামীর কাছে লুকিয়ে রাখা প্রয়োজন, কখনই করবে না। স্বামী হয়ত দেখে না কিন্তু খোদা দেখে থাকে আর একদিন তা প্রকাশ পেয়ে স্ত্রীর মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। তার আর কোন সম্মান থাকে না। তিনি বলেন স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কিছু হয়ে যায় তা কখনই আড়াল করবে না। সত্যি কথা বলে দেবে এতই মান রক্ষা হবে। আর লুকিয়ে রাখলে শেষাবধি সসম্মান হানির সম্মুখীন হতে হয়। নারীর মর্যাদার স্খলন ঘটে। ....ক্রোধান্বিত হয়ে স্বামীর সঙ্গে বিশৃঙ্খলাকারী নারীর কোন সম্মান থাকে না। বেশিরভাগ সময় এই অশান্তি এই অধৈর্যের কারণেই হয়ে থাকে যখন তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো হয় এতে ঝগড়া বাড়তেই থাকে। তিনি বলেন :

"তোমাদের এমন বিবাদের কারণে যদি রাগের মাথায় (সে) কিছু বলেও বসে তখন তোমাদের খুবই অসম্মান হবে। পরে যখন স্বামীর ক্রোধ ঠান্ডা হয়ে যায় তখন হয়ত ধীরে-সুস্থে এই ভুলের কথা বলা যেতে পারে। সংশোধন করাও কর্তব্য।

এরপর হযরত আম্মাজান (রাঃ) তাঁর মেয়েকে এই উপদেশ প্রদান করেন যে, "স্বামীর আত্মীয় স্বজন ও তাদের সন্তানদেরকে নিজের মনে করবে। যেমনটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিতেও আমি কথা বলেছি যে, একে অপরের আত্মীয় স্বজনদের নিজের মনে করবে। তিনি বলেন, কারোর অমঙ্গলের কথা তুমি চিন্তাই করবে না। কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও মন থেকে তার জন্য মঙ্গল কামনা করবে।

তোমাদের সঙ্গে কেউ অন্যায় করে করুক কিন্তু তোমাদের মনে কখনই যেন তার অনিষ্টের চিন্তা না আসে। আর কাজের দ্বারাও তার ক্ষতির প্রতিশোধ নিও না। এরপর দেখবে খোদা সবসময় তোমাদের মঙ্গল করবেন। আবার তিনি (রাঃ) বেশিরভাগ ছেলে-মেয়েদেরকে এই উপদেশও প্রদান করতে থাকতেন যে, নিজের নতুন ঘরে যাচ্ছ সেখানে এমন কথা বোলো না যাতে তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম নেয়। আর তোমাদের নিজ মাতার বদনামের কারণ হয়। শ্বশুর বাড়ির ব্যাপারে কখনই প্রবেশ করা উচিত নয়। তাদের যে, সমস্যা হচ্ছে হতে দাও। আর শাশুড়ী ও ননদের কথা অভিযোগের সুরে স্বামীকে বলাও উচিত নয়।

(সালানা ইজতেমা লাজনা ইমাউল্লাহ্ ইউ, কে ৪অক্টোবর ২০০৯, আলফযল ইন্টার ন্যাশনাল ১৮ ই ডিসেম্বর ২০০৯)

ইসলাম নারীকে শিক্ষিকা রূপেও উপস্থাপন করেছে। শুধুমাত্র পরিবারেই শিক্ষয়ত্রী রূপে নয় বরং সমাজ সংস্কারকের দায়িত্বও নারীর উপর অর্পিত। একজন আহমদী নারী উপর এই দায়িত্বও বর্তায় যে, সে যেন সমাজে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের প্রসারতা ঘটানোর চেষ্টা করে। অপরের দুর্বলতাসমূহকে প্রকাশ করার পরিবর্তে যেন তা আবৃত করে রাখে। পৃথিবীকে সংশোধনের দায়িত্ব আল্লাহতা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর ন্যস্ত করেছেন আমাদের এই মহান দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তখনই আমরা সমাজকে সুরক্ষিত করতে সক্ষম হব। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাবলীর দিকে অন্যদেরকে আহ্বান করতে সক্ষম হব।

হুজুর বলেন :

"লাজনাদের যে সংগঠন আহমদী মহিলাদের তরবিয়তের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আহমদী মহিলাদের মধ্যে এই অনুভূতি যেন সৃষ্টি হয় যে, জামাতের মধ্যে আমাদের একটা নিজস্ব ও স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। আমাদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদি পুরুষদের সঙ্গে আমাদের কাজের সুযোগ নাও থাকে আমরা আমাদের সংগঠনের অধিনে সে কাজ করতে পারি।..........এই উদ্দেশ্যে লাজনাদের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরী করা হয় এবং তরবিয়তি এজলাস ইত্যাদি হয়ে থাকে। .... ইজতেমা হয়ে থাকে, ...ইজতেমা, জলসা ও এজলাস সসমূহের যে প্রোগ্রাম ইত্যাদি তৈরী করা আপনারা অধিক অধিক সংখ্যায় এতে অংশগ্রহণ করুন। আপনাদের যেসমস্ত বোনেরা এসবে দুর্বলতা প্রদর্শন করে তাদেরকেও নিজেদের সাথে শামিল করুন। তাদেরকেও ভালোবেসে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এসব অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। এর ফলে নিজের সাথে সাথে অন্যদেরও সংশোধন করতে থাকবেন আর দুই দিক থেকে আপনারা পুণ্য অর্জন করবেন। এই যে অন্যদের সংশোধনের চিন্তা এটা নবীদের চিরাচরিত রীতি। নবীগণ এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত থাকতেন।"

(ন্যাশনাল ইজতেমা লাজনা ইমাউল্লাহ্ ইউ. কে ২০০৫)

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী !

সময়ের সংক্ষিপ্ততাকে লক্ষ্য রেখে খুবই সংক্ষেপে আপনাদের সম্মুখে তরবিয়ত সংক্রান্ত গুটিকয়েক উপদেশাবলী রাখলাম মাত্র। পরিশেষে আমি হুজুর আকদশ (আইঃ)-এর এই বার্তা যা হুজুর লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারতের

যুগ ইমামের বাণী

আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাকে সখল সৌন্দর্যের অধিকারী পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২২)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 7 Mar, 2019 Issue No.10

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১ম পাতার শেষাংশ..........

দৃষ্টিহীন থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- **'মান কানা ফি হাযিহি আমা ফা হুয়া ফিল আখিরাতি আমা'** (বনী ইসরাঈল: ৭৩) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ থাকবে। যে পরকালে দেখার জন্য ইহজগত থেকেই দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যেতে ইচ্ছুক, সে যেন অবশ্যই পরকালের জন্য ইহজগতেই তার জন্য সেই অনুভুতি গড়ে তোলে। সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিবেন অথচ তা পূর্ণ করবেন না, এটি কল্পনা করাও কি সম্ভব!

কোন ব্যক্তি দৃষ্টিহীন?

দৃষ্টিহীন বলতে এখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এক ব্যক্তি অন্ধ অনুকরণ করে, কারণ সে মুসলমান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছে আর সে মুসলিম হিসেবে পরিচিত। অনুরূপভাবে আরেকজন খৃষ্টান পরিবারে জন্ম নেওয়ায় সে খৃষ্টান। এই কারণেই এমন ব্যক্তির হৃদয়ে খোদা, তাঁর রসুল এবং কুরআনের প্রতি কোন সম্মান থাকে না। ধর্মের প্রতি তার ভালবাসাও আপত্তিজনক। খোদা ও তাঁর রসূলের অবমাননাকারীদের সঙ্গে তার ওঠাবসা। এর একমাত্র কারণ হল, এমন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে দৃষ্টিশক্তিহীন। তার মধ্যে ধর্মের প্রতি ভালবাসা নেই। ভালবাসায় পরিপূর্ণ নিজের প্রেমাস্পদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি কি কিছু অপ্রিয় কথা শুনতে চাইবে? মোট কথা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, আমি তো দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, যদি তুমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও। অতএব এই দোয়া করাই এই নির্দেশ পালনের প্রস্তুতি স্বরূপ।

এরপর সূরা বাকারার প্রারম্ভেই যে বলা হয়েছে- 'হুদাল্লিল মুত্তাকিন', এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। অর্থাৎ এই পুস্তক মুত্তাকিদেরকে উৎকর্ষের পরম মার্গে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এর গ্রন্থ তাদের জন্য উপকারী যারা অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকে এবং উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এই পর্যায়ের মুত্তাকি তারা যারা কপটতা মুক্ত হয়ে সত্যের আহ্বান শুনতে প্রস্তুত হয়। যেমন যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সে মুত্তাকি হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। যখন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তির সুদিন আসে, তখন তার মধ্যে তাকওয়ার উন্মেষ ঘটে এবং আত্মম্ভরিতা ও অহংকার দূরীভুত হয়। কেননা, এগুলি তাদের পথের অন্তরায় ছিল যা দূরীভূত হয়েছে। যারফলে তাদের অন্ধকার ঘরের জানালা উন্মুক্ত হয়েছে এবং আলোক রশ্মি প্রবেশ করেছে।

হুদাল্লিল মুত্তাকিন। অর্থাৎ এই গ্রন্থ মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত স্বরূপ। 'ইত্তিকা' শব্দটি আরবীর 'ইফতিয়াল' নামক ধাতু থেকে উদ্ভুত আর ব্যকরণগতভাবে এই শব্দমূল দ্বারা সংগ্রামকে বোঝানো হয়। ভিন্ন বাক্যে এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমরা এখানে যতটুকু তাকওয়া দেখতে চাই তা সংগ্রামহীন নয় আর এটিকে রক্ষা করার জন্য এই গ্রন্থে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে। মোটকথা মুত্তাকিদের জন্য পুণ্যকর্ম সম্পাদনের পথে পরিশ্রম ও সাধনা করা অনিবার্য।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২-১৪)

(ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম, মুবাল্লিগ সিলসিলা)

****

সালানা ইজতেমা ২০১২ উপলক্ষ্যে প্রেরণ করেছিলেন তার কিছু অংশ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করব। দোয়া করি আল্লাহতা'লা আমাদেরকে হুজুর (আইঃ)-এর নির্দেশাবলীর উপর যথাযোগ্য আমল করার তৌফিক প্রদান করুন।

হুজুর বলেন,

"জাতীর জীবন এবং ক্রমোন্নতিতে নারীর একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কোন সমাজ, জাতি আর দেশের উন্নতির রহস্য তার নারীদের উন্নত শিক্ষা সংস্কৃতি ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার উপর নির্ভরশীল। এজন্য সব সময় এটা খেয়াল রাখবে যে, আপনি শুধু মাত্র মহিলা-ই নন বরং আপনি একজন আহমদী মহিলা। আল্লাহর দাসী, আপনি নাসেরাতুল আহমদীয়া- এটা খুবই মর্যাদার একটা স্থান। এমনিতে ইসলাম নারী জাতিকে খুবই উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। এই মর্যাদাকে বিলক্ষণ অনুভব করুন। এই অনুশাসনগুলিকে নিজেদের জীবনে স্থান দিন যা কোরআন করীমে উল্লিখিত রয়েছে। কোরআনি শিক্ষাবলীর সৌন্দর্যে নিজেকে এবং নিজের সন্তানদেরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলীকে অধ্যয়ন করার অভ্যাস তৈরী করুন যা আপনার আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক এবং জ্ঞানের ভান্ডারকে পরিপূর্ণ করবে। অপ্রয়োজনীয় এবং সময় নষ্ট করার কারণ হয় এমন বৈঠক সমূহ, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানাদি এবং ওয়েব সাইট থেকে নিজেরাও দুরত্ব বজায় রাখুন, আর নিজের ছেলে-মেয়েদেরকেও নিষেধ করুন। এমন কি যদি নিজের ভাই, বোন বয়োঃজ্যেষ্ঠদেরকেও বোঝাতে হয় তবে ভালোবেসে ও প্রকৌশলে তাদেরকে বোঝান যে এসব বিষের সমতুল্য। যা পান করে তোমরা কেউ অবশিষ্ট থাকতে পারবে না। স্বাজাতি এবং স্বদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি শালীর জন্য আপন আপন ক্ষমতাবলীকে যথাযোগ্য ব্যবহার করুন। পৃথিবী তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা থেকে বিমুখ হয়ে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরছে। তাই হে আহমদী নারী ! আজ আপনারাই মধ্যযুগের মহিলাদের ন্যায় বীরত্ব ও শিক্ষা-দীক্ষা এবং বুদ্ধিমত্তা নিজেদের অন্তরে সৃষ্টি করে, ইসলামের সৌন্দর্যায়িত শিক্ষাবলীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এ ধরাপৃষ্ঠকে এক অদ্বিতীয় খোদার দিকে নিয়ে আসার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও নারীরা বীরত্ব ও বাহাদুরির কর্মকাণ্ড করেছে। তারা জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের বৈঠক ও এজলাস ইত্যাদির আয়োজন করেছে। পর্দা অথবা তাদের নারী হওয়া শেষ যুগেও কোন কর্তব্য পালনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। আর না এখন হতে পারে। আর ভারত ভূমিও এরকম সহস্র সহস্র নারীর ত্যাগ ও আত্মবলিদানকে কখনও বিস্মৃত হতে পারে না। এই পুণ্যভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের গোপিনীরা সেই ত্যাগ ও সত্যের প্রচার প্রসার ঘটিয়েছে যাকে ইতিহাস কখনও ভুলতে পারে না।

সুতরাং আজ ব্যথিত মানব জাতিকে পুনরুদ্ধার, বিশ্বকে এক খোদা ও এক রসুল (সাঃ) এবং এক অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার দিকে নিয়ে আসার জন্য নিজেদের মধ্যে একটা পবিত্র পরিবর্তন এবং সেবার মানসিকতা তৈরী করুন। নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে উত্তম তরবিয়ত দান করুন যাতে তারাও চিরস্থায়ী ভাবে এই পুণ্যকর্মের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে।

হুজুর বলেন,

আমি প্রার্থনা করি যেন আল্লাহতা'লা আপনাদের সবাইকে এই মহান ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ও তৌফিক দান করেন। এবং নেক বংশের উত্তরাধিকারী বানান। আর আপনাদের চেহারার জ্যোতি তা এই পৃথিবীতেও যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে আর পর পারেও। আপনাদের কপাল সব সময় যেন পবিত্র সন্তান-সন্ততিদের মাতা হওয়ার গর্বে উদ্ভাসিত হতে থাকে। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

আল্লাহ্‌র বাণী

" আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের জন্য তোমাদের (এমন) কসমসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলা ফরয করিয়াছেন (যদ্দারা কষ্ট ও কলহ সৃষ্টি হয়)।।" (তাহরীম : ৩)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

হাদীস

" নামায ত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরের নিকটবর্তী করে দেয়"

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir